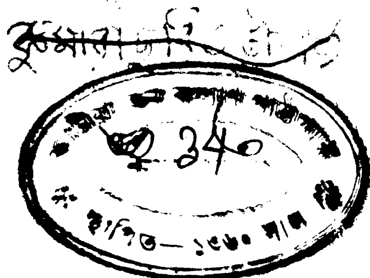
# অভিশপ্ত বংশ







প্রকাশক
ডিক্সনস্
৩২ সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

দাম—দেড়টাকা।

প্রিণ্টার—
শ্রীবঙ্কিম বিহারী বেরা।
পাথের প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭১ বি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

# উৎসর্গ

ডাক্তার অতুল কৃষ্ণ রক্ষিত বি-এস্-সি, এম্-বি
ডি এম্ আর ই ( লণ্ডন ) এল্ এম্ ( ডাবলিন )

বন্ধু

'অভিন্ন হৃদয়' যাকে বলে, তুমি ছিলে আমার তাই। জীবনের চাঁদের আলোতে এবং ঝড়ের রাতে উৎসবের দিনে আর রোগশয্যায় তোমার আমার মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি। এমন নিবিড় ক'রে গভীর ক'রে একান্ত ক'রে আর কাউকে ভালোবাসিনি, আমিও না, তুমিও না। হঠাৎ যেদিন মাঝ পথে তুমি চ'লে গেলে আমাকে একলা ফেলে, সেদিন থেকে পৃথিবী আমার শূন্য হয়ে গেছে। সাহিত্যসাধনায়ও মন নেই। আমাকে তুমি যেমন বুঝেছিলে, তেমন ক'রে আর কে বুঝবে? মোটরে, নৌকোতে, ষ্টীমলঞ্চে, পদব্রজে, তাসখেলায়, গল্প করায়, হোলিতে, বিজয়ায়, সিনেমায়, মন্দিরে, যখনি তোমাকে সঙ্গী পেয়েছি, আনন্দ আমার ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। রাজদ্বার থেকে শ্মশান অবধি গিয়ে আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল, কিন্তু স্মৃতির বেদনা র'য়ে গেল চির-জীবনের। তোমার মতন বন্ধুকে কেউ ভুল্তে পারে না। তোমার মতন বন্ধু কেউ পায় না।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

৺বিজয়া ১৩৫১

# ভূমিকা

অভিশপ্ত বংশ রংমশালে যখন প্রকাশিত হয়, তখন মাসের পর মাস যারা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিল, আজ তাদের দেখা পেলে হয়! আশ্চর্য্যের কথা এই যে, স্নেহাস্পদ প্রকাশকরাও শিশু মন নিয়ে গল্পটি শেষ করে, এবং উৎসাহের সঙ্গে প্রচারে উদ্যোগী হয়। শিল্পী শ্রীমান্ সুপ্রকাশ সেনও নিষ্ঠার সঙ্গে ছবিগুলি এঁকেছে। আমার লেখা যারা পছন্দ করে, তারা বুঝতে পারবে ফাঁকি দিতে আমি চেষ্টা করিনি। যাদের ভালো লাগ্‌বে তাদের সংখ্যা যদি যথেষ্ট হয়, তাহ'লে প্রদীপের পরবর্ত্তী জীবনের কাহিনী পরে বার করা যাবে।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলকাতা

## অভিশপ্ত বংশ

১

হলুদ রংএর বাড়ী। নাম বুঝি তাই হল্‌দে কুঠি।

তবু প্রাসাদের সমস্তটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। গাছ-পালায় আড়াল পড়ে। বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া গাছ, ওক্ আছে, দেবদারু আছে, ইউক্যালিপটাস্ আছে, আছে আম জাম কাঁঠালের বন।

ফটক পার হ'য়ে শামুকের সাদা খোলা দিয়ে বাঁধানো, ফিকে লাল পুরনো রাস্তাটা দিয়ে চ'লে যাও, দুপাশে ঠাণ্ডা গাছের ছায়ায় শুক্‌নো পাতার রাশ, অনেকখানি চ'লে পাবে দেউড়ি। ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড উঠোন, চক্‌মিলানো। বাড়ীর মধ্যে খালি সিঁড়ি, ঘরের পর ঘর, ছাদের পর ছাদ, বারান্দার পর বারান্দা।

সব শূন্য, সব খাঁ খাঁ।

বারবাড়ীর বৈঠকখানায় তালা দেওয়া। নেই সেখানে পুরুষ কণ্ঠের অট্টহাসি। অন্দরের রান্নাঘর ঝুলে ভরা। নেই সেখানে নারীহস্তের কঙ্কনানিক্কণ।

# অভিশপ্ত বংশ

এত বড় পুরী লোকজনে যা একদিন গম্‌গম্ করত, আজ যেন অপরাহ্ণের ম্লান আলোতে থম্‌থম্ করতে থাকে। বাইরে দরোয়ানদের অলস গলার গান, গাছে পাখীদের ক্বচিৎক্লান্ত স্বর সেই একটানা স্তব্ধতাকে আরো গম্ভীর আরো অসহ্য ক'রে তোলে।

এখনো সব ঘর আমাদের দেখা হয়নি। বাকী আছে অনেক অনেক দিক্।

তবু বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে পড়ি।

এত বড় 'হলে' এত বইয়ের লাইব্রেরী, এমন কমই দেখেছ।

বইয়ের আলমারী প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে, চারিধারের দেয়াল ভ'রে আলমারীর পর আলমারী।

সেখানেও বই ধরেনি। র‍্যাক্ শেল্‌ফ টেবল্ বোঝাই ক'রে শেষে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, লাল, নীল, সবুজ, কালো মলাটের অসংখ্য অগুন্তি বই।

ঘরের সমস্ত শার্সীগুলো লাগানো। রঙীন কাচ, শুধু সাদা নয়, তাতে রং বেরংএর কত না ছবি আঁকা—কত সমুদ্রের, কত অরণ্যের দৃশ্য, কত বনের বাঘ, কত দীঘির সারস, কত ছেলে-মেয়ের ছুটোছুটি।

তার ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের যে পড়ন্ত রোদ এসে এখানে ওখানে পড়েছে, তারও আভা যেন মায়াময়। চোখে যেন ঘোর লাগে।

# আত্মশক্তি রহস্য

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে তবে নজরে পড়ে, একটি বৃদ্ধ ঘূর্ণায়মান চেয়ারে ব'সে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যেন কী পড়ছেন।

খানিক পরে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। রোগা, অতিরিক্ত লম্বা লোকটি, পাকা আমের মতন টক্‌টকে রং, দীর্ঘশ্মশ্রু একেবারে সাদা হ'য়ে যায়নি, কাঁচাপাকায় হরিহরমূর্ত্তি, মাথার চুল পাৎলা হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। মর্ম্মভেদী সে দৃষ্টি।

বইয়ের মাঝখান দিয়ে লম্বা ঘরটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তিনি পায়চারী করলেন অনেকবার।

শেষটা আরাম কেদারায় শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে কী ভাবতে লাগলেন।

বাড়ীটার কিছু তফাৎ দিয়ে গঙ্গা ব'য়ে গেছে।

স্রোতের টানে সাদা ও কমলা রংএর পাল তুলে দিয়ে নৌকো চলেছে।

নদী যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে সারি সারি কলের চিম্‌নী। ঠিক্ ওপারে শিবের দ্বাদশ মন্দির, কার যেন বাগান-বাড়ীর ঘাট। ওপারের সমস্ত সবুজ গাছগুলোর মাথায় সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছটা লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঈশান কোণের মেঘ আকাশে মাথা তুলে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো।

# অভিশপ্ত কক্ষ

মাঝিরা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো ঘাটে তরী লাগাবার জন্যে। এলো, এলো কালবৈশাখী।

বৃদ্ধ দরজার কাছে এসে ডাকলেন—পার্ব্বতী।

ভৃত্য পার্ব্বতীচরণ বেঞ্চের ওপর বসেছিল—সাড়া দিলে—হুজুর!

ঝড় আসছে নাকি রে? ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে!

বারান্দায় বেরিয়ে এসে সে বল্‌লে—আস্‌ছে।

তাহ'লে আজ সে আস্‌বে।

বৃদ্ধের স্বরে উত্তেজনা।

সার্শীটা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে তারপর নিজেই বল্‌লেন—ঝড় আস্‌ছে। বছরের প্রথম ঝড়। আজ সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। বন্ধ ক'রে দে ফটক। লছমন সিং!

নীচে থেকে দরোয়ান হাঁক্‌লো—হুজৌর!

বন্ কর্ দেও বাহারওয়ালা কেওয়াড়ি!

খানিক পরেই বললেন—নেহি, রহনে দেও। আনে দেও উস্‌কো। বন্ করনেসে আউরভি মুস্কিল। আনে দেও, যো হোয়, সো হোয়!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়, বাগানের গাছে গাছে মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শেষে একটানা শোঁ শোঁ শব্দে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল, ধূলোতে বালিতে ঠাণ্ডা বৃষ্টির গুঁড়োতে আলো অন্ধকারের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য গ্রীষ্মদগ্ধ

পৃথিবীর ভালোই লাগবার কথা—কিন্তু জীর্ণ বৃদ্ধের চোখে যেন আশঙ্কার বন্যা এলো।

ঝড় তখনো চলেছে।

হঠাৎ—ঝড়ের মধ্যেই তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ—ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

চমকে উঠে বৃদ্ধ গিয়ে তাঁর চেয়ারে বস্‌লেন কান দুটো চেপে। সদর থেকে আর্ত্তনাদ মহলের পর মহল পার হ'য়ে অন্দরের দিকে প্রসারিত হল—ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!

বৃদ্ধের কণ্ঠ ভয়ে করুণ ও ক্লান্ত—দোব দোব—যা যা তুই যা, সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠ—না, না এখনি ফিরিয়ে দাও, আজই ফিরিয়ে দাও—বীভৎস বিশ্রী কলহের মতন শোনাতে লাগলো।

সেই ফিকে অন্ধকারে একটি ফর্‌সা ছেলে ছুটে এসে প্রশ্ন করলে—কে ও দাদু, কী ফিরিয়ে নিতে চায়?

বৃদ্ধ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—তুই যা যা প্রদীপ, এখান থেকে যা।—তুমি চ'লে যাও। তুমি চ'লে যাও, আমি ফিরিয়ে দোব যখন বলেছি, দোবই।

কবে দেবে? আর কবে দেবে?

বাইরে ঝড়ের আওয়াজ তখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠেছে। গাছের ডালপালা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক একটা দম্‌কা হাওয়ায় খড়খড়ি শার্সী ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠছে। পুরোন বাড়ীর ভিত্ পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠছে।

# অভিশপ্ত বংশ

সেই ঝড়ের মধ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই রহস্যঘনমূর্ত্তি তার অদ্ভুত আবেদন নিয়ে মিলিয়ে গেল।

ক্রমে ঝড় থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার হ'ল।

পড়ার ঘরে একলা ছোট ছেলে প্রদীপের দুর্ব্বল মনে সেই আশ্চর্য্য প্রার্থনার কথাই বারবার আঘাত ক'রে ফিরতে লাগলো। কেন ও বল্‌লে—'ফিরিয়ে দাও' 'ফিরিয়ে দাও'?

সাম্‌নে আরো অন্ধকার রাত। তাকে একেবারে একলাটি শুতে হবে। তারায় ভরা নীল আকাশের ভয়দূরকরা চাঁদের আলো আজ নেই।

মাষ্টারমশায়ের আস্‌তে দেরী হচ্ছে। পড়ায় তার মন বস্‌ছে না।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে সে বসেছে। এই বই প'ড়ে নাকি তার দাদুও বাংলা শিখেছিলেন। প্রথমে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় পড়েছিলেন।

যাই হোক্‌, সে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এতদিন পড়ছিল—ক আর র—কর; ঘ আর র—ঘর; এখন দেখছে বেশ মিল্‌ আছে, যদিও ফাঁক ফাঁক ক'রে লেখা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| কর | ঘর | ধর | কর |
| পর | মল | ধর | ফল |
| যত | কয় | তত | নয় |
| গত | হয় | কত | সয় |

ঠিক কবিতার মতন।

তারপর— সরস দল পনস ফল

সরল নল তরল জল—শেষ ক'রে এখন তাকে পড়তে হবে—

ক-এ আকার কা আর ল—কাল।

ক-এ আকার কা আর ক—কাক।

নিজে নিজেই বিস্তর পরিশ্রম ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে প'ড়ে দেখে ওমা, একি? এও যে কবিতা!—

কাল কাক ভাল নাক।

কাটা কাণ ফাটা শাণ॥

শিকি চাই টিকি নাই।

মণিহারা ফণীপারা॥—কী আশ্চর্য্য!

আরো আশ্চর্য্য তার লাগে এ কথা ভাবতে, এখন ত' এত কষ্ট ক'রে বানান ক'রে ঘেমে উঠে একটি একটি ক'রে সে কথা শিখছে! পরে এমন দিন আস্‌তে পারে যে বই হাতে করলেই সে তর্‌তর্ ক'রে গল্প পড়তে পারবে, মাষ্টারমশায়ের মতন!

চাই কি এরকম একটা বই সে লিখেও ফেল্‌তে পারে!

না, অতদূর ভরসা করবার তার সাহস নেই।

এই সময়ে মাষ্টারমশাই এসে গেলেন। যাক্ ভয় খানিকটা দূর হ'ল।

একজন মাষ্টারমশাই পাশে থাকা যে কী ভাল, বলা যায় না।

সে বল্‌তে পারে, অন্য ছেলেদের কাছে, যে তার একজন মাষ্টারমশাই আছেন—যদিও অন্য ছেলেদের সঙ্গে কতটুকু বা তার দেখা হয়? ক্বচিৎ কখনো কেউ যদি বাগানে ঢুকে পড়ে, তবেই।

মাষ্টারমশাই কিন্তু সকলের থাকে না। প্রদীপ সে খবর নিয়েছে। আর থাক্‌লেও, এত ভালো মাষ্টারমশাই খুব কম লোকেরই থাকে, প্রদীপ ভালো রকমই জানে, কেউ না বল্‌লেও।

তিনি মোটে মারেন না। যে মাষ্টারমশাইরা মারে, তাদের লোকে বলে মাষ্টার। মশাই কিছুতেই বলেনা।

প্রদীপের মাষ্টারমশাইয়ের নাম প্রণববাবু। ভয়ানক শক্ত বানান করা। তার নিজের নামের মতন। এখনো র-ফলায় সে পৌঁছয়নি, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে, অন্য ছেলেদের মতন পোদীপ বলে না। একেবারে পদবী পর্য্যন্ত বলে, আমার নাম—প্রদীপ মল্লিক।

ছেলেরা জিজ্ঞেস্ করে যখন—তোর বাবার নাম কি? বলতে পারে না। ওটা তাকে শেখানো হয়নি। তারা তাদের বাবার নাম বলে। আর হাসে।

মাষ্টারমশাইকে আজকে প্রশ্ন করে—আপনি জানেন আমার বাবার নাম কি? মার নাম কি?

আমি কি ক'রে জান্‌বো বলো? গিয়ে জেনে নিয়ো

তোমার দাদুর কাছ থেকে। আরো আগে জানা উচিত ছিল।

একদিন জিগেস্ করেছিলাম দাদুকে। দাদুর মুখ অমনি গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। বল্লেন, তোমার দরকার কি?

আবার যেন বাইরে ঝড়ের আওয়াজ আস্ছে। মনে হয় প্রদীপের—আবার যদি সেই রকম কথা বলে এসে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটা! আবার যদি দাদু চেঁচামেচি করেন? ঘোর অন্ধকার বাইরে। ঘোর অন্ধকার দালানে। এখন ওসব না হওয়াই ভালো। কিন্তু কান পাতলে কি শোনা যায় না অনেক অ-নে-ক দূরে 'ফিরিয়ে দাও'?—

এই বংশের একটু ইতিহাস এইবার জানা দরকার।

প্রদীপের প্রপিতামহের নাম ছিল হারাণ। ও নামে কিন্তু তিনি পরিচিত ছিলেন না, লোকে তাঁকে জান্ত হারু ডাকাত ব'লে। ইচ্ছামতীর চরে, ধলেশ্বরীর ধারে, আড়িয়ল খাঁর পারে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় হারু ডাকাতের দল-বল দূরের যাত্রীদের পথরোধ ক'রে যথাসর্বস্ব হরণ করত। এই জলদস্যুর দলকে মহাজনরা ভারী ভয় করত।

কিন্তু হারু ডাকাতের দলের একটু বিশেষত্ব ছিল এই যে

# অভিশপ্ত বংশ

ধনীর বিশেষ ক'রে অত্যাচারী ধনীর, ধন লুণ্ঠন ক'রে তারা বিলিয়ে দিত দরিদ্র নিরীহদের হাতে।

অর্থাভাবে অন্নাভাবে গরীব বিধবারা যখন রুগ্নশিশু কোলে নিয়ে ক্রন্দন করছে, হঠাৎ তাদের হাতে মোহরভরা থলি এসে পড়েছে কত দিন। কে দিলে, কেন দিলে, তার কোন পাত্তা নেই।

হারাণ তাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বরকে এ সব ব্যাপার থেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন এবং ভালো শিক্ষকের হাতেই তার পড়ার ভার দিয়েছিলেন! নানান্ বিষয় মেধাবী ছাত্রের মতন বিশ্বেশ্বর অধিগত করছিল। কিন্তু অনেক রাত্রে পিতা আসেন না, এ সংবাদও তার কাছে গোপন রইলো না।

রাশি রাশি টাকা নিয়ে এসে ভোররাত্রে আলো জ্বেলে বাইরের ঘরে ভাগ-বাটোয়ারা; মাঝে মাঝে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে মায়ের কান্না; আত্মীয়স্বজনদের বকাবকি; সব কিছু জড়িয়ে বিশুর শিশুচিত্ত এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠত। দুল্‌তে দুল্‌তে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ভাবটা কেটে গিয়ে বেপরোয়াভাবের উদ্রেক হল, দলের অন্য অন্য সঙ্গীদের কাছে নানা বীরত্বের গল্প শুনে শুনে তার মনেও ঐ রকম অসমসাহসিক কিছু করবার বাসনা জাগলো। পড়াশোনা উঠলো মাথায়।

নিতান্ত ছোট যখন সে, তখন থেকেই এক সাক্‌রেদের কাছে লাঠি খেলা তার শেখা হ'ল। শেষে এক রাত্রে সে গিয়ে বসলো এক চরে।

অন্ধকারে নদীর বুকে একটা নৌকোর আলো দেখা গেল, তারপর সন্সন্ ক'রে ছিপ্ চল্লো কয়েকখানা। 'আর হারে রে রে রে!' কী ভীষণ আওয়াজ নদীর এপার ওপার কাঁপিয়ে—তারপরেই মেয়েদের গলার আকুল আর্ত্তনাদ। পিতার আড্ডা কুসুমপুরের চর থেকে বিশু এই সব শুন্‌লো। ফিরে এলো খাড়িটায় সাঁতার কেটে।

বৃদ্ধ বয়সে হারাণের দল যখন ভেঙে গেছে প্রায়—এলো তৈরী হ'য়ে বিশু সর্দ্দার তেল পাকানো বাঁশের লাঠি নিয়ে। 'বিশু ডাকাত' 'বিশে ডাকাত' প্রসিদ্ধ হ'য়ে গেল গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায়।

লম্বা লম্বা রণ্‌পায় চ'ড়ে বিদ্যুৎগতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে তারা লুটের মাল উত্তর বাংলা থেকে পূর্ব্ব বাংলায় নিয়ে যেত।

রক্তে রাঙা হ'য়ে যেত নদীর জল, রক্তে রাঙা হ'য়ে যেত বাঁধানো আঙিনা। তিন টাকার জন্য বিশু খুন করত। বিশু ডাকাতের হাতে কারুর নিস্তার ছিল না।

বৃদ্ধ রুগ্ন হারাণ বার বার বলতেন—ওরে, এত পাপ সইবে না। দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার করিস্ না। আর প্রাণে মানুষকে মারিস্ না। আজ অবধি আমার হাতে মরেনি কেউ।

রাখো তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব—বিশু গর্জ্জন ক'রে উঠত। যে হারু সর্দ্দারের ভ্রূ একটু কুঁচ্‌কে গেলে সা-জোয়ান লোকরা

কাঁপ্তে থাক্ত, আজ সে জরাজীর্ণ ব'লে সেদিনকার-ছেলে বিশু তাকে উপহাস ক'রে যায়! বাপ হ'লেও এতটুকু মানে না। গায়ের জোরে, দলের প্রতাপে বিশ্বেশ্বর তখন ধরাকে সরা দেখ্ছে।

হরিণডাঙা গ্রামের ছিটেবেড়ার ঘরে হাঁপানী রোগী সারা রাত কাসে, কাঁথায়, বালিশে সেলাই করা বেচারার কটাই বা টাকা আছে?

রাত দুটোয় এক ধাক্কায় ভাঙা দরজা ভেঙে পড়লো—বুড়ি জিগ্যেস করলে—কে পেসন্ন এলি?

প্রসন্ন বুড়ীর ভাই পো।

উত্তরে একটা হুঁ ব'লেই গলায় পড়লো হাত। খানিকটা ছটফটানি, তার পর সব শেষ। অপঘাত মৃত্যুর মুখে বুড়ি জেনে গেল তার ভাইপো তাকে প্রাণে মারলে, যাকে সে মানুষ করেছে। বিছানা বালিশ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে পাওয়া গেল একশো পাঁচ টাকা। তারই জন্যে একটা প্রাণী হত্যা হ'য়ে গেল।

জমিদারের বাড়ীতে সন্ধ্যেরাতে ডাকাত পড়লো। দরোয়ান বেহারা বিশু ডাকাতের নামেই তটস্থ, বাধা দেবে কি? গ্রামের লোক বিশু ডাকাতের গলার আওয়াজেই কাঁপছে, বেরোবে কি! দরজার পর দরজা ভেঙে অবলীলাক্রমে বিশু এগিয়ে চল্লো। জমিদারকে বেঁধে বিষম মারলে। মেয়েদের

শিশুদের কাউকে বাদ দিলে না। ধর্ম্মভীরু জমিদার অনুনয় ক'রে বল্‌লেন—যা নেবার সব নাও, প্রাণে মেরোনা।

বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো, বড় ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, সিন্দুক ভেঙে যথাসর্ব্বস্ব ধনসম্পত্তি, মেয়েদের গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়ে ধানের গোলা লুট ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। গ্রামের চালা গুলো ধরে গেল। বোম্ কালী, বোম্ মহাদেব, হর-হর বোম্ বোম্,—পাপমুখে ভগবানের নাম করতে করতে বিশুডাকাতের দল রণ্‌পায় চ'ড়ে বস্‌লো।

পাঁচদিন পরে যে দারোগা তদন্ত করতে এলো, যারা সাক্ষী দিতে গেল, সকলকার মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভেসে চল্‌লো।

রাত ছেড়ে সে দিনে ডাকাতি সুরু করলো। বিশু সর্দ্দারের ভয় নেই। কোনখানে কোন প্রমাণ সে রাখত না।

হারাণ তখন মারা গেছেন। দলে এসেছে ভাঙন, এসেছে বিশ্বাসঘাতকতা। বিদ্রোহ করছে সব।

সেই সময়ে একদিন ঘন জঙ্গলে মহারাণী বসন্তকুমারীর হাতিতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্বখাজনা চলেছে, বিশু আট্‌কালে পথ। মাহুতকে বল্‌লে, হাতির মাথায় মারো ডাঙস্, করো তাকে পাগল। আমাকে টাকা দিয়ে মানে মানে প্রাণ বাঁচাও।

পাগলা হাতি বন থেকে বনে ছুটে চল্‌লো। ঠিক্ দিনে সদরে খাজনা জমা হলোনা। নীলামে উঠ্‌লো জমিদারী,

কিনে নিলে বিশ্বেশ্বর মল্লিক, মহারাণী বসন্তকুমারীর সেরা সেরা মৌজা ও তালুক।

সেই থেকে তিনি জমিদার মছলন্দপুরের। লোকের চোখে সম্মানিত, রাজার দরবারে সমাদৃত।

স্ত্রী পরিহাস করলে বললেন—বাংলার কথা ছেড়ে দাও, ভারতবর্ষে ক'জন জমিদার আর রাজা মহারাজা আছেন, নাম করো ত' যাদের পূর্ব্বপুরুষ ডাকাত ছিলনা?

তারপর উঠলো গঙ্গার ধারে প্রাসাদ। তারপর হ'ল পড়বার ইচ্ছে, আর বইয়ের সখ। এলো মাইনে করা অধ্যাপকরা।

বিশ্বেশ্বর রাজসাক্ষী হ'য়ে ধরিয়ে দিলেন তার দলকে। কেউ গেল ফাঁসী, কেউ বা দ্বীপান্তর। তিনি মুক্তি পেয়ে আরাম-কেদারায় গিয়ে বস্‌লেন। তাঁর 'দক্ষিণ হস্ত' কুঞ্জলাল বধমঞ্চে ওঠ্‌বার আগে ব'লে গেল, খুন জখম রাহাজানি—কিছুই তুমি বাদ দাওনি। আমরা যা কিছু করেছি—সবি তোমার হুকুমে। করেছ রাশি রাশি অন্যায়, তারপর আমাদের ধরিয়ে দিয়ে নিজে সাধু সেজে স'রে গেলে! এতখানি পাপ কি ভগবান সহ্য করবেন? আইনের বিধান এড়িয়ে গেলে, কিন্তু বিধির বিধান কি এড়াতে পারবে সর্দ্দার? আমি ত এই মূহূর্ত্তে ম'রে শান্তি পাব, কিন্তু তোমার জীবনে তিল তিল ক'রে যে মৃত্যু যন্ত্রণা, তার কথা কি ভেবে রেখেছ?

বিশ্বেশ্বর শুধু হেসেছিলেন।

ভগবান কি আছেন? যদি থাকেন, নিদ্রিত। কত অন্যায় পৃথিবীতে নিত্য হ'য়ে যাচ্ছে, কত অত্যাচার, কত অপরাধ, কী শাস্তি তার দেখা যায়?

হোম যাগ যজ্ঞ পাঁঠাবলি উপাসনার ঘুষ দিয়ে মানুষ কি অনায়াসে মুক্তি পাচ্ছে না?

টাকার গদির ওপর ব'সে বিশ্বেশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে মৃদু হাস্য করেন মাত্র।

সাত ছেলে চার মেয়ে তাঁর।

বড় ছেলে আর বড় মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—ঘর আলো করা বৌ, সভা উজ্জ্বল-করা জামাই।

অন্য ছেলেমেয়েগুলি স্বাস্থ্যে বুদ্ধিতে শক্তিতে দীপ্ত।

স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারকে সুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তিনি লাইব্রেরীঘরে ঢোকেন। দেশ বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার, গ্রহউপগ্রহের অসংখ্য খবর। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো ক্রমে পড়ে তাঁর প্রসন্ন মুখে, বিশ্রী অতীতকে তিনি ভুল্‌তে চান, রমণীয় ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তুল্‌তে চান। দেখ্‌তে চান বিস্মৃত অতীতের ওপর অনাগত ভাবী কাল তাঁর জন্যে কত পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে।

দশহরায় বাড়ীর পাশে গঙ্গাস্নানে গেছেন, ছোট ছেলে তাঁর চোখের সাম্‌নে ডুবে গেল, কিছুই করতে পারলেন না।

অভিশপ্ত বংশ

দিন পনেরো বাদে অন্নের গ্রাস সবে মুখে তুলেছেন—বড় মেয়ে একেবারে পাগল হ'য়ে ফিরে এলো। খবর নিয়ে জামাই মারা গেছে হার্টফেল ক'রে।

ঝড়ে বাগানের গাছের ডাল ভেঙে প'ড়ে সেজ ছেলে পড়লো আর মরলো।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—বিধাতার বিচার সুরু হয়ে গেছে।

প্রতিকার করতে বেরোলেন।

গ্রামের প্রান্তে বিধবা নিস্তারিণী একটি ছেলে নিয়ে থাকে। সেদিন অপরাহ্ণকালে সেই ছোট ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। সেদিনও পৃথিবী কাঁপিয়ে ঝড় উঠ্‌লো, নিস্তারিণীর ছেলে ফিরে গেল না। অরণ্যের মধ্যে পুরাতন ডাকাতে-কালীর সামনে যে এক নরবলি দেওয়া হয়েছিল সকল গ্রহের শান্তির জন্যে, সে কথা তার মা জানলো না। 'ফিরিয়ে দাও' 'ফিরিয়ে দাও' ব'লে অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে সে ফিরে গেল।

বছর না ঘুরতেই পঞ্চম পুত্র আর ছোট মেয়ে এমন জ্বরে পড়লো যে ছ'মাসের বেশী বাঁচলো না।

নিজে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হ'য়ে বিশ্বেশ্বর শুনলেন—বড়ছেলের কুষ্ঠ দেখা দিয়েছে, বড় বৌ আত্মহত্যা করলো। এক একটা আঘাত শেলের মতন এসে বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো।

বংশ যখন যেতে বসেছে, তখন তাঁর নজর পড়লো বড় নাতি—একমাত্র পৌত্র প্রদীপের দিকে। রুগ্নকণ্ঠে তিনি

আর্তনাদ ক'রে বললেন—বাঁচাও, ওকে আগে বাঁচাও। বাঁচাও ওকে সমস্ত বিপদ থেকে। ও থাক্‌লে, আমার সব থাক্‌বে।

সেইদিন সেই মুহূর্তে ঘুমন্ত প্রদীপের গলা কে টিপে ধরেছে।

টিপে ধরেছে তার মেজকাকা।

সহজ মানুষ, বেশ ছিল, হঠাৎ কখন পাগল হ'য়ে গেল।

প্রদীপ ঘুমোচ্ছিল, শাঁখের মতন সাদা, ফুলের মতন নরম গলাটি দেখে তার মনে হল চেপে ধ'রে দেখা যাক, কি হয়! পাগলের ত কাণ্ড!

শেষ হ'য়ে যেত ছেলেটা, বাঁচালো পার্ব্বতী, পাশ থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে মেজবাবুকে সরিয়ে দিলে, সরিয়ে দিতেই সে রেগে দিলে তার আঙ্গুল কামড়ে, রক্তারক্তি কাণ্ড।

লোকজন ছুটে এসে পাগলকে বেঁধে ফেলে।

সেই পাগল থাকে বাঁধা এক ঘরে, মাঝে মাঝে চেঁচায়।

দুই মেয়ে পর পর বোবা হ'য়ে গেল, পাগলের বাড়া, কথা কয় না, ন'ড়ে বসে না। খাইয়ে দিলে খায়, নয়ত না। রাত দুপুরে কী এক রকম শব্দ করে।

# অভিশপ্ত বংশ

বাড়ীটা যেন চিড়িয়াখানা।

দাতুর অ্যালবাম্ খুলে একখানা ফটো দেখছে প্রদীপ—ঝুলের মতন কালো একটি মেয়ের, মুখ চেনা যায় না, কাপড় পুড়ে গেছে, চুল পুড়ে গেছে—বীভৎস চেহারা—পার্ব্বতী বলে তার মা মারা যাবার পরে পুলিশ এই ফটো তুলেছিল। ভয় করে দেখলে।

একদিন বিকেলে সদর অন্দরের মাঝামাঝি দালানে একটি লোককে আসতে দেখেছিল, মুখটা ফুলো আর লাল, এক দিক্‌টা যেন গ'লে গেছে—দাতু ছুটে এসে বললেন—যাও, যাও তুমি আবার এসেছ কেন? তোমার ছেলে ভয় পাবে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখনি।

হাতে-পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় লোকটি তবু ভিতরের বারান্দার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো। দাতু অনেক চেঁচামেচি করলেন, পার্ব্বতীকে বললেন—খোকাকে টেনে নিয়ে যা, ও ভয় পাবে।

পার্ব্বতী বলে, ঐ নাকি তার বাবা।

অন্য কাকারা ছুটে গেল তার বাবাকে ধ'রে বার ক'রে দিতে—একটা গোলমাল উঠ্‌লো—ওরা বল্‌তে লাগলো—রস লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের গায়ে—সর্ব্বনাশ. আমাদেরও কুষ্ঠ হবে' 'বেশ করব' 'খুব করব' 'খুন করব'—কী গোলমাল

হুটোপাটি ! প্রদীপ ভয়ে কাঁটা। তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়লো, তার বাবাকে সে দেখতে পেলেনা ভালো ক'রে। হ'লোই বা খারাপ দেখতে, তবু ত তার বাবা! বাবা হ'লেই ত ছেলেকে ভালোবাসেন। হয়ত তিনি ভালোবাস্তেই এসেছিলেন!

কেন এসেছিলেন, সে জবাব মাষ্টার মশাইও দিতে পারলেন না।

এখন সে ইংরেজী পড়তে সুরু করেছে। ঝক্-ঝকে নতুন বই—MODERN READER.

কালো রঙের অনেক ছবি আছে। রঙীনও কয়েকখানা। সমস্ত ছবি সে দেখে শেষ করেনি, সব পাতা ওল্টায়নি, পাছে সব ছবি দেখা হ'য়ে যায়, আর কিছু দেখবার না থাকে।

একখানা ভালো ছবি আছে মাঝখানে, সেটি শুধু আগেই দেখেছে, সীতাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে জটায়ু পাখীর পাখার দিকে অস্ত্র তুলেছে রাবণ। কষ্ট হয় দেখলে।

মাষ্টারমশাই বলেছেন, রবি বর্ম্মার আঁকা বিখ্যাত ছবি ওখানা। কে রবি বর্ম্মা? উনি বলেছেন—রাজা রবি বর্ম্মা। কোনো রাজা এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে? সে ভাবতে পারে না।

মাষ্টারমশাই বলেন, পড়ো।

ও পড়ে—That cat on the mat can catch

a bad rat. কী শক্ত মানে! কিছুতেই মনে থাকে না। সে এখন যোগ দিতে শিখেছে। ৪৯৬ লিখে তলায় ৫৮৭ লিখলে আঙুলে গুণে গুণে সে যোগফল লিখে দিতে পারে। খুব তাড়া দিলে হবে না। একটু সময় দিলেই হবে।

পড়া হ'য়ে গেলে মাষ্টার মশাই তাকে বেড়াতে নিয়ে যান, বেশী দূরে নয়, গঙ্গার ধারে।

যেদিকে বাজার আছে, অনেক বাড়ী আছে, অনেক লোক আছে, সেদিকে নয়। যেদিকে কেউ নেই, শুধু সেইদিকে। একটু অন্ধকার হয়ে গেলে হলদে কুঠীর দিকে লোকে আসতেই চায়না। সবাই বলে—এ বাড়ীতে ভূত আছে। ভূত থাকলে কখনো প্রদীপ থাকতে পারে?

একটা প্রকাণ্ড ঘরে সে একেবারে একলা শোয় শুনে বাবী ব'লে মেয়েটা অবাক্ হয়ে গেল।

ফুল তুলতে এসেছিল সে। তাদের বাড়ীতে পুজো। তার ঠাকুমা বললে—যা ঐ বড় বাড়ীতে যা। ওখানে অনেক ভালো ভালো ফুল আছে। চুপি চুপি নিয়ে আয়।

মালী ত' ঢুকতেই দেয়না। অনেক বলে কয়ে প্রদীপ তাকে রাজী করায়। বলে—আহা নিক্‌না ছেলেমানুষ!

শুনে বাবীর হাসি পায়। ঐ ত এককোঁটা ছেলে, ও আবার তাকে বলে ছেলেমানুষ। মনে মনে বলে—আ-রে ছেলেটা!

সংসারে কারুর ভালো করতে নেই।

প্রদীপের জন্যেই ত বাবী কোঁচড়ভরা ফুল পেলে, আঁচলে ত রীতিমত একটা পোঁটলা বাঁধা হল, কিন্তু যাবার সময় না একটা ধন্যবাদ, না একটা মিষ্টি ক'রে—আসি ভাই!

রাগে প্রদীপ কথাই বল্‌তে পারলেনা।

অনেক কথা আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অত কথা সে জানেই না!

মেয়েটা কিন্তু প্রদীপের চেয়ে ভালো আছে বল্‌তে হবে! যে বাঁশবাগানের ওপারে কী আছে প্রদীপ জানেনা, তার মাঝখান দিয়ে একলা মেয়েটা চ'লে গেল, কতক্ষণ অবধি তার টক্‌টকে লাল শাড়ী আর কুচকুচে কালো পাড় দেখা যেতে লাগলো—তারপর সে মিলিয়ে গেল। ওধারে হয়ত মাঠ আছে, সবুজ রংএর ক্ষেত আছে, কিম্বা লাল নীল সাদা গোলাপী একতলা দোতলা সব বাড়ী আছে, দূরে দূরে খোলার চাল ও খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়ে ঘর আছে, কত কী থাকতে পারে। হাট বাজার এমন কি রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

ওদিক্‌কার কোনো খবরই প্রদীপ জানে না। মাষ্টার-মশায়ও যেতে দেন না।

বড় বড় নারকোল ও তালগাছের সিরসিরে পাতাগুলো ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে তাকে যেন ডাকে—দেখবে এস এধারে কি আছে।

মেঘগুলো ভেসে ভেসে ওদিকে চলে যায়, পাখীরা

যায়—তারাও যেন ব'লে যায়—দেখ্‌বে এসো এদিকে কী আছে !

বাবী যেদিকটা থাকে, সেদিকটা রহস্যময় না হ'য়ে যায়না। নইলে ও কোথা থেকে অত অফুরন্ত হাসি আর চঞ্চল গতি পায় ?

কাকাদের আর পিসিদের সে দেখতে পায় না। সমস্ত বাড়ীটায় সব ঘর শূন্য, শুধু লাইব্রেরী ঘরে আর তার পাশের ঘরে প্রদীপ আর দাদু।

মাঝে মাঝে—বছরে চারবার—বারবাড়ীর ঘরগুলো খুলে যায়—প্রজাদের খাজনা জমা নেবার জন্যে নায়েব খাজাঞ্চিরা পাততাড়ি খুলে বসে, তারপরে তারা কোন্ কাছারি বাড়ীতে চ'লে যায়।

সেই সময়টা টাকার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ, রাশি রাশি নোট আর রেজকি গোণার ব্যস্ততা, হাতে পায়ে ধরা, হুঙ্কার—সমস্ত নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে গম্‌গম্ ক'রে তোলে।

তারপরে আবার দীর্ঘ বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলি। অনেক রাত পর্য্যন্ত খটাস্ খটাস্ ক'রে দাদুর খড়মের আওয়াজ, আর ঝিলমিলির ওপারে অন্দরের দিক থেকে 'মারলে' 'মেরে ফেল্‌লে' আর্ত্তনাদ, কালপেঁচার ডাকের সঙ্গে ; অর্দ্ধেক রাত

পার হ'য়ে যায়। জ্বল্‌জ্বলে শুকতারা নিয়ে ভোরের আলো আসে প্রথম তার শিয়রের জান্‌লা দিয়ে সমস্ত ভয় দূর ক'রে। ভারী আরামের ভারী ভরসার ভোরের আলো।

একটা লেস্পাতিবার বাবী এলো সকালে ফুল নিতে।

প্রদীপ বলবার আগেই বল্‌লে—আজ আমি দুপুরে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসব। একলাটি থাকো। আমার নাম স্নিগ্ধা, ডাকে বাবী ব'লে। তোমার যেটা খুসি বোলো। তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে একটু আধটু বড় হবে। তা হোক্‌গে বাপু তা ব'লে আমি দাদা বল্‌তে পারব না। প্রদীপই বল্‌ব।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে বাবী চ'লে গেল।

সত্যি এলো সে দুপুর বেলায়। প্রদীপ চেয়ে ছিল বারান্দা থেকে সেই বাঁশবনের দিকে। আঁচল দুলিয়ে দুলিয়ে বাবীকে আসতে দেখে খুসিই হল।

সমস্ত দুপুর সমস্ত বিকেল কী যে গল্প হল তার ঠিক নেই, বাবী এত বক্‌তেও পারে! আর প্রদীপের ভালো লাগাকেও বলি! সঙ্গী পায় না বেচারা!

'চলো ত দেখি তোমাদের লাইব্রেরী ঘর!' প্রদীপকে ঠেলতে ঠেলতে বাবী চল্‌লো।

দাদু তখন ছিলেন না, তিনি ছাতে।

সে ঘরে শুধু বই নয়, দেশবিদেশের আশ্চর্য্য সব সংগ্রহ ছিল—মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ, লক্ষ্ণৌ ও কৃষ্ণনগরের

মাটির তৈরী খেলনা, জয়পুরের আগ্রার গয়ার মার্ব্বেল, সাদা ও কালো পাথরের শিল্প, মহীশূরের চন্দনকাঠ ও কাশ্মীরের চিত্রবিচিত্র কাঠের কারুকার্য্য, পাটলীপুত্রের পুরাতন শিলালিপি কত জিনিসই না থরে থরে সাজানো। একটি একটি ক'রে নিবিষ্ট মনে দেখতে হয় সারাদিন ধ'রে।

দরজার পাশে একটা মানুষপ্রমাণ কালো নিগ্রো মূর্ত্তি ছিল কাঠের না কিসের তৈরী। সে নাকি মিশর না কোন্ দূর দেশ থেকে আনা। সেই মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়ে বাবীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মুখটা অবশ্য খুবই বীভৎস। কিন্তু তারো চেয়ে ভয়ের কথা আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে কথা মনে করতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়।

প্রদীপের কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরে বাবী বল্‌লে—চলো ভাই, আমরা ওঘরে যাই।—তার গলার স্বর কিন্তু কাঁপছিল সেতারের তারের মতন। প্রদীপ বুঝতে না পেরে বল্‌লে—কেন?

কেন আবার কি! দেখা ত' হল সব।

একেবারে বাইরের বারান্দায় প্রদীপকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সামনে পিছনে চারিধার দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বাবী বললে—ও মূর্ত্তিটার চোখ নড়ে?

হেসে প্রদীপ বললে—চোখ নড়বে কি? চোখের জায়গাটা ত ফাঁকা। ভেতরটা একদম ফাঁপা।

মানুষ ঢুকতে পারে ভেতরে? বাবীর ব্যগ্র প্রশ্ন।

তা পারে বৈকি।

তাহ'লে কেউ ঢুকেছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি চোখের তারা নড়ছে এদিকে ওদিকে। একবার আবার চোখের পাতা ফেললে।

প্রদীপ ত হেসেই বাঁচে না! তা কী ক'রে হবে? ওখানটা অন্ধকার ব'লে দেখতে ভুল হয়েছে।

চলো ত দেখি।—সত্যি হলে দরোয়ানদের ডাকব। ভয়টা কিসের?

দুজনে গিয়ে যেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেছে, দেখে দাদু বসে আছেন। দেখেই রুক্ষ গলায় বললেন—এ ঘরে কেন? যাও এ ঘর থেকে।

দাদুকে দেখলেই প্রদীপের গলা শুকিয়ে যায়। তবু বললে—দাদু ঐ যে নিগ্রোর মূর্ত্তিটা আছে না, ওর চোখ না?—

এ রকম 'না' দিয়ে কথা দাদু পছন্দ করেন না, থামিয়ে দিয়ে বলেন—কী বাজে বকছ? ও মেয়েটা কে?

ও বাবী।

বাবী আবার কে? ও কেন এখানে আসে?

আমার বন্ধু।

তোমার বন্ধু? বাড়ী যেতে বলো। রাত হয়ে গেছে

বাবী ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মনে মনে অরসিক বুড়োর মুণ্ডপাত করতে করতে।

যাবার সময় বলে গেল—প্রদীপ ভাই তুমি আজ একটু সাবধানে থেকো। আমি বলছি তোমায়, ওর ভেতর কেউ আছে।

—তুমি ভাই আজ এখানে থাকো না, তাহলে আমার সাহস হয়।



প্রদীপের জন্যেই বাবী ফুল পেলে ( পৃঃ ২১ )

—বাবী গম্ভীর হয়ে পাকা গিন্নীর মতন বলে—আমার থাকার ভাই ঢের ঝঞ্ঝাট্! এদিকে তোমার দাদু বুড়ো, ওদিকে আমার দিদিমা বুড়ি দুজনেই সমান। এও থাকতে দেবে না, সেও থাকতে দেবে না। নইলে তোমাকে বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।

—তুমি কী ক'রে বাড়ী যাবে ? অন্ধকার হয়ে এলো।

—ঐ ত একটু জ্যোৎস্না আছে। এক ছুটে যাব।

বাবী আর দাঁড়ালো না।

দাদু একটুক্ষণের জন্যে বাথরুমে গেছেন, প্রদীপ মূর্ত্তিটার মুখে টর্চ্চ ফেললে—দেখলে দুটো চোখের পল্লব যেন চম্‌কে পড়ে গেল ! প্রদীপের শরীর তখন হিম হ'য়ে গেছে।

ব্যাপারটা ভালো লাগ্‌লোনা প্রদীপের। এর আগেও ত ও মূর্ত্তিটা অসংখ্যবার দেখেছে, কখনও তার চোখ নড়্‌তে দেখেনি। চোখ ত ছিলই না, তার তারা কোথায় ? সবটা ত ফাঁকা।

মাঝে মাঝে ওর [illegible] হয়েছে পিছন দিক্ দিয়ে ভিতরে ঢুক্‌তে। ডালাটা [illegible] মূর্ত্তিটা এত অসম্ভব ভারী যে নাড়াচাড়া করতে সাহস হয়নি। তাছাড়া মূর্ত্তির মাথা পর্য্যন্ত ও পৌছত না, অন্ততঃ সাড়ে পাঁচফুট লম্বা লোক হওয়া চাই।

খবরটা দাদুকে দেবে কিনা ভাব্‌ছিল। কিন্তু দাদু যা গম্ভীর। আর আজ ত সন্ধ্যে থেকে আকাশের তারা দেখ্‌ছেন তিনি। ছায়াপথ নিয়ে নাকি একটা প্রবন্ধ লিখবেন কাকে বলছিলেন। মাষ্টারমশাই কিম্বা পার্ব্বতীকেও কিছু বলা কি উচিত নয় ? ভৌতিক ব্যাপারও ত হ'তে পারে ? কিন্তু ভুতটা যদি চ'টে যায় ? কাজ নেই রাত্রের অন্ধকারে কোনো কিছু ক'রে। সকালবেলায় আলোতে দেখে না হয় ব্যবস্থা করা

যাবে। খাওয়াদাওয়া সেরে সে শুতে গেল। একলাঘরে তার শোয়া। অন্যদিন ভয় করে না, আজ করছে। বাইরে দালানে পার্ব্বতী শোয়। তবুও।

দরজার খিলটা আর ছিট্‌কিনীটা সে ভালো ক'রে বন্ধ করলে। মাথার দিকের জান্‌লাটা খোলা রইলো, তার আবার গরাদে নেই। ওদিক্ থেকে কেউ আস্‌তে পারবে না। শুধু তারার আলো সেদিন পৃথিবীতে এসে পড়েছিলো. অন্ধকার পৃথিবীতে। ঘুমন্ত গাছগুলিতে অসংখ্য জোনাকী জলছিল। যেন পাতায় পাতায় মুকুলে মুকুলে আলো, ঝিক্‌মিক্ ঝিক!

এগারোটা বাজ্‌লো, বারোটা বাজ্‌লো, প্রদীপ জেগে জেগে শুন্‌লে।

একটার ঘণ্টাও ঢং ক'রে বেজে গেল। তখনো তার ঘুম আস্‌ছে না। যদিও বা একটু আস্‌ছে. কোথাও কিছু খুট্ ক'রে শব্দ শুনে চট্ ক'রে ভেঙে যাচ্ছে।

এবারে আওয়াজটা স্পষ্ট, দরজায় মিহি যন্ত্র চালাবার মতন যেন। ওপরের ছিট্‌কিনীটা যেন নেমে পড়্‌লো। খিল্‌টা আস্তে আস্তে কে যেন তোল্‌বার চেষ্টা করছে।

পাশবালিশটাকে চাদর ঢাকা দিয়ে খাট ছেড়ে প্রদীপ নেমে পড়্‌লো। ওধারের আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোলো। চোর কিম্বা ভূত যদি আক্রমণ করতে চায়, আগে পাশ-

বালিশটাকে করুক্! সেখান থেকে শুনতে পেলে, খিলটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে গেল। ছায়ার মতন একটা মূর্ত্তি—দেখা যায় কি না যায়—তার খাটের দিকে এগোতে লাগ্‌লো। কি করলে সেখানে, দেখা গেল না। তারপর জান্‌লায় উঠে বাইরে পা বাড়ালো। ভূত নয়, ভূত অত স্পষ্ট হয় না, সাদা কাপড় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ততক্ষণে দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রদীপ পার্ব্বতীকে ঠেলে তুলে বলেছে—চোর !

চোর ? সঙ্গে সঙ্গে চীৎকারে দরোয়ান ও লোকজনেরা উঠে পড়লো। চোর—চোর—চোর !

বিশ্বেশ্বর উঠ্‌লেন। চোর ? কোথায় চোর ?

জান্‌লার ধারে এসে বিশ্বেশ্বর দেখলেন টর্চ্চ ফেলে—একটা লোক জলের পাইপ ধ'রে সাবধানে নামছে, তার মুখে আলো ফেলে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—চিরঞ্জীলাল !

ততক্ষণে নীচে সে তৃণভূমির ওপর লাফ্ দিয়েছে, পায়ে লাগার দরুণ খানিকটা থম্‌কে ব'সে তারপর অন্ধকারে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

দরোয়ানরা ছুটে তাড়া করতে গিয়ে পেলে না তাকে।

ফিরে বিছানায় টর্চ্চ ফেলে বিশ্বেশ্বর চম্‌কে উঠ্‌লেন, পাশ-বালিশে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা গোঁজা !

পার্ব্বতীকে উনি বললেন—কুঞ্জলালের ছেলে চিরঞ্জীলাল আমার বংশলোপ করতে এসেছিলো। ভগবান্ রক্ষা করেছেন

কিন্তু বুঝতে পারছ, এখন থেকে কত সাবধান হ'তে হবে? খুন ক'রে যেত প্রদীপকে ও নিজে বুদ্ধি ক'রে স'রে না গেলে।

সাবধান হওয়া যার জন্যে, সেই শুধু বুঝতে পারলো না কেন এসব কাণ্ড? তাকে খুন করবে লোকে? কেন? সে ত কারুর কোনো ক্ষতি করেনি! খুন করা মানে ত' মেরে ফেলা? তাকে কেন মার্বে? এ সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তার বুদ্ধি একটু যেন বেশী।

সকালবেলা বাবা এসে সব কথা শুনে কেঁপে কেঁপে অস্থির।

বল্লে—আমারি ভুল হয়েছিল প্রদীপ, সে-ই যখন দেখ্‌লুম, কেন চেঁচিয়ে লোক জড় করলুম না! বুঝেছি, কেন তোমাকে খুন করতে এসেছিল। তোমার দাদু যে ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন,—

ধেৎ—প্রদীপ বাধা দেয়। অবিশ্বাস্য কথা কেন সে শুন্‌বে?

না, সত্যি, আমি বাবা কাকা সকলের মুখে শুনেছ। মিথ্যে নয় এক ফোঁটাও! ডাকাত থেকে পরে জমিদার হয়েছেন। কুঞ্জলাল ব'লে ওঁর একটা সঙ্গী ছিল, উনি তাকে ধরিয়ে দিতে তার ফাঁসী হয়ে যায়। তারি ছেলেপুলেরা তোমায় মেরে ওঁকে শাস্তি দিতে চাইছে নিশ্চয়। তুমি ত' বলছ—দাদু বলেছেন কুঞ্জলালের ছেলে চিরঞ্জীলাল এসেছিল!

প্রদীপ প্রতিবাদ করে—উনি মেরেছেন, ওঁকে মারবে। আমায় মেরে তাদের কী লাভ ?

কী লাভ, বাবীও সেটা ভালো বুঝতে পারে না। বলতে পারে না। সত্যি ত', একজনের দোষে আর একজনকে মারা কেন ?

শুধু বলে—তুমি বাপু একটু সাবধানে থেকো। আমার আবার ভাবনা ঢুকে গেল মাথায়। এ আবার এক জ্বালা হ'ল !

প্রদীপকে ভাল লেগেছে বাবীর।

বিশ্বেশ্বর মনে করলেন—চিরঞ্জীলালকে ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু ধরাবেন কি ক'রে ? সে ত' ফেরার। পুলিশই ত' তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার। কি ক'রে সে এসেছিল, কোথায় লুকিয়েছিল, প্রদীপের মুখে তার বিস্তৃত বিবরণ শুনে বললেন—মুখের গ্রাস ফসকে গেল!

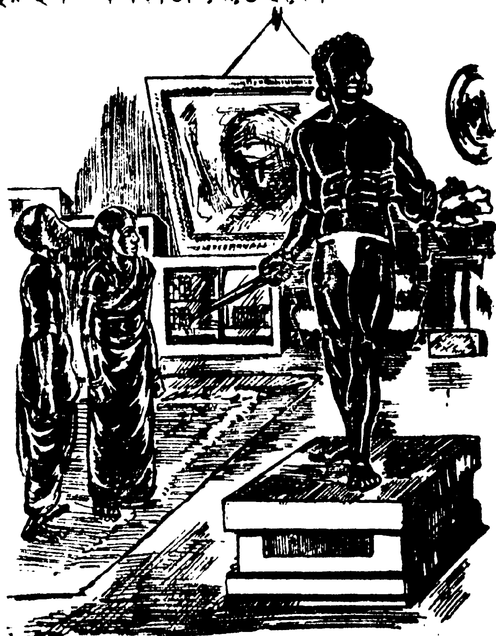
সেইদিনই প্রদীপের জানলায় লোহার গরাদে বসলো। চারিধারে পাহারা রইলো। ঘরের মধ্যে পার্ব্বতী। হুঁসিয়ার পার্ব্বতী।

সন্ধ্যে থেকে সমস্ত গৃহকোণ তন্ন তন্ন ক'রে দেখে সদরের কোলাপ্সিবল্ গেট্ বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। কিন্তু তবু সে রাত্রে অজানা আশঙ্কায় কারুর ঘুম হল না—না প্রদীপের, না তার দাদুর, না লোকজনের।

তার পরের রাতও এম্‌নি।

তারও পরের রাত।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—এ রকম ক'রে ত শরীর খারাপ হয়ে যাবে। একটা বিহিত করা দরকার। নায়েবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির হল—কলকাতা যেতে হবে।



বাবীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ( পৃঃ ২৪ )

প্রণবও বল্‌লে—সেই ভালো। এসব ব্যাপারে কলকাতা শহর অনেকটা নিরাপদ। পল্লীগ্রামে কখন্‌ কি ঘটে বলা যায়

৩৪৩ অচিন্ত্য বন্দ্য

না। হয়ত একদিন ডাকাতই পড়লো। ডাকাতরা কী না পারে? কেটেকুটে রেখে গেলেও কিছু করবার নেই।

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন—না, এ বাড়ীতে কখনও ডাকাতি হবে না, নিশ্চিন্ত থেকো। এক সর্দ্দারের কাছে যারা লাঠিধরা শেখে, তারা সব গুরু-ভাই। ডাকাতদেরও নীতি আছে। তবে পরের পুরুষ কী করে, বলা যায় না।

বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে কানাঘুষা প্রণবও শুনেছিল। তাই হঠাৎ ব'লে বস্‌লো—যাই বলুন, ডাকাতি বড় ঘৃণ্য কাজ। যাক্‌, এখন তাদের বিষদাঁত ভেঙে গেছে, আগের মতন যেখানে সেখানে আর ডাকাতি হ'তে পারে না।

হ'তে পারে না বলেই দেশের কল্যাণ গেছে। একদিন বাংলা দেশে একদল ডাকাতি করত, আর একদল তাদের রুখ্‌ত, দুদলেরই গায়ে শক্তি ছিল, মনে সাহস ছিল। আজ সব ভীরু দুর্ব্বল হয়ে গেছে। আজ যারা ডাকাত, তারাও ভীতুর একশেষ, অভাবে প'ড়ে এগিয়ে আসে, আর হাতের হাতিয়ারের জোরে কাজ সাফ্‌ করে। তাদের ঠেকাবার লোক ত' নেই দেশে বল্‌তে গেলে। ডাকাতের হুঙ্কার শুনেই আজ লোকে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপে, বাধা দেবে কি? তাও সব বাঙালী ডাকাত নয়। পাঞ্জাবী, মুসলমান, পেশোয়ারী।

ও প্রসঙ্গ আর বাড়তে না দিয়ে প্রণব যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি,

প্রদীপ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কপালে কার ঠাণ্ডা হাত ঠেক্‌লো। চোখ মেলে দেখে, বাবী। কোমল কণ্ঠে সে বল্‌লে—তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ প্রদীপ ?

হ্যাঁ ভাই ! আবার ত আস্‌ব।

ম্লান হেসে বাবী বল্‌লে—কবে আস্‌বে তার কিছুই ঠিক্ নেই। তোমার সঙ্গে আর হয় ত আমার দেখা হবে না।

তুমিও আমাদের সঙ্গে চলোনা।—প্রদীপ প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো।

বাবী বল্‌লে—সে হ'লে ত বেশ হয়, কিন্তু—

দাঁড়াও দাছুকে বলি। বল্‌লে প্রদীপ উৎসাহে।

দাছু রাজী হলেন না!—না, ও পরের মেয়ে আমি নিয়ে যেতে পারব না। ওর বাপ মা ছাড়বে কেন ?

হঠাৎ প্রদীপের মন কেমন ক'রে উঠলো। তার মনে হ'ল বাবী না গেলে তার বিপদ অনেক। সত্যি, ও পরের মেয়ে, তার প্রয়োজন ব'লেই ত আর যেতে পারে না! কী জোর আছে তার ওপর ? মুখ মলিন ক'রে বাবী চ'লে গেল। দেখে গেল প্রদীপের ছ'চোখে জল। সে-ও বাড়ীতে গিয়ে খুব কান্না জুড়ে দিলে। সকলে বলে—কী হয়েছে ?—না, প্রদীপ চ'লে যাচ্ছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছে, তোর কি ? এ কথা ব'লে কোনো মীমাংসা হল না। শেষ অবধি প্রদীপের মোটর ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দেখে ও বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

গোখেল রোডে ওদের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

প্রদীপ যখন জান্‌লে—সেখান থেকে গড়ের মাঠ একেবারে কাছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেশী দূর নয়, কালীঘাটও মনে করলেই যাওয়া যেতে পারে, চিড়িয়াখানাও হেঁটে পৌঁছানো যায়, তখন তার মনে খানিকটা স্ফূর্ত্তি হল।

তবু মোটরে ক'রে খানিকটা ঘুরে আসতে শহরে যখন আলো জ্বলে উঠ্‌ত, দোকানপাটের আলোর সারি রাজপথের দুধারে মালার মতন ছড়িয়ে যেত, তখন তার মনে পড়ত—অন্ধকার বাঁশবাগানের ওপারে কোনখানে এক বাড়ীতে বাবা ব'সে আছে একলাটি।

কলকাতায় কোন বিপদ্ ছিলনা। কিন্তু একদিন সকাল-বেলায় কী এক চিঠি এলো, দাদু প'ড়ে রেগে অস্থির। তার মাষ্টারমশাই বল্‌লেন, তার ন-কাকা আর নতুন কাকা যারা নাকি জুয়া খেলে, রেস্ খেলে, কোথায় থাকে ঠিক নেই, চিঠি লিখে শাসিয়েছে অবিলম্বে বিশ হাজার টাকা না পেলে তার দাদুকে খুন করতেও পিছ্-পা হবে না। তার চেয়েও কঠিন শাস্তি তারা দিতে চায়, প্রদীপের মাথা ফাটাবে, ঐ নাকি সকলের চক্ষুশূল! চিরঞ্জীলাল তাদের দলে আছে।

ভয়ের চেয়ে প্রদীপের হাসি আসে। বাপ মাকে যে

দেখ্‌লো না, ছোটবেলা থেকে যে স্নেহযত্নবঞ্চিত, ভবিষ্যতে কী বিষয় পাবে না পাবে, তার জন্যে এত লোক তাকে শেষ করতে চায়! শেষ অবধি নিজের কাকারা! তার চেয়ে দাদু কেন সমস্ত টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে কোনো কুঁড়ে ঘরে চ'লে যান্‌না! কী দরকার ছিল রোজ রোজ এই সব বিপদ্‌ ডেকে আন্‌বার?

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় দাদুর কাছে যেতে তিনি বল্‌লেন— আজ থেকে তুমি আর বাইরে বেরুবে না। রাতদিন বাড়ীতে থাক্‌বে।

প্রদীপের চোখে জল এলো। সেইদিনই পড়ন্ত বেলায় গড়ের মাঠে সে ঘুরে এসেছে নরম সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে, মেমোরিয়ালের ধার দিয়ে। সেখানে রোজ রোজ যেতে তার ইচ্ছে করে, এখন থেকে আর যাওয়া হবে না! আরো এগিয়ে দেখেছে সিনেমাগুলির সাম্‌নে রঙীন আলো, উজ্জ্বল আলো রাতকে দিন করবার চেষ্টা!

এই গোখেল রোডের পীচ্‌ঢালা নির্জ্জন গলিপথে শহরের সে সব সৌন্দর্য্য এসে পড়ে না, আসে না সেই সব বিচিত্র লোকেরা কোনোদিন রাস্তা ভুলে।

গ্রামের প্রকাণ্ড বাড়ীতে সে যেমন বন্দী ছিল, এখানেও ত প্রায় তেম্‌নি।

কিন্তু বেশী কিছু বল্‌তে পারলে না, বেশী বলা তার স্বভাব নয়।

বাড়ীর সাম্‌নে পাগড়ী ও পায়জামা-পরা কটা লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। ওপরের বারান্দার দিকে তারা কী দেখে ?

প্রদীপ হয়ত দাঁড়িয়ে আছে, একটা দাড়িওলা লোক তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো না গিল্‌তে লাগ্‌লো। প্রদীপ সরে না। শান্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একদিন দুপুরবেলা লোকটা বল্‌লে—খোকা টফি খাবে ? চকোলেট খাবে ? ত' এসো।

গম্ভীরভাবে প্রদীপ বল্‌লে—আমি ওসব খাই না।

লোকটা চ'লে গেল, সোনালী রূপালী রাংতা মোড়া জিনিসগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে ঝল্‌ঝলে পকেটে পুরে। প্রদীপ মনে মনে বল্‌লে—আমি জানি তোমার বদ্‌মায়েসী, নীচে যাই ঐ সব নিতে, আর তুমি আমাকে ক্যাক্‌ ক'রে ধরো !

কোথায় কি একটা অসুবিধা হচ্ছিল, দাদু একদিন বিকালে বল্‌লেন—আমরা এক জায়গায় যাব। কোথায় তা বল্‌ব না। লোকজন কেউ জান্‌বে না। শুধু সঙ্গে যাবে প্রণববাবু আর পার্ব্বতী।

ট্রেণে চ'ড়ে প্রদীপ জান্‌তে পারলে—ওরা দার্জ্জিলিং মেলে উঠেছে, তাহ'লে যাচ্ছে দার্জ্জিলিং।

বাবীটা কি বোকা, যদি আস্‌বার ব্যবস্থা কোনোরকমে করতে পারত, তাহলে এই সুযোগে দার্জ্জিলিং দেখা হ'য়ে যেত।

প'ড়ে রইলো সেই গ্রামের অন্ধকারে। আর কি কখনো হবে? আর প্রদীপেরও কি একলা কিছু ভাল লাগ্‌বে? দার্জ্জিলিং যতই না কেন সুন্দর হোক্!

শিলিগুড়িতে ট্রেণ থেকে নেবে দাদু একটা মোটর করলেন, তখন সবে মাত্র ভোর হচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে কী চমৎকার রাস্তা চলেছে! খানিক পরে ওরা যেন এলো পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের রাজ্যে! কোথায় কত নীচে নদী, গ্রাম, মাঠ! মেঘ, কুয়াসা, জঙ্গল, পাহাড় অদ্ভুত সব দৃশ্য একসঙ্গে।

প্রদীপ শুন্‌লে, ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে যে পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না, যার গায়ে ছোট্ট ছোট্ট সাদা বাংলো, সে সব ছাড়িয়ে ওপাশে আরো উঁচুতে চলে যেতে হবে।

জঙ্গল আর নেই। শুধু হাল্‌কা মেঘ ভেসে আস্‌ছে, আর শীত করছে। গরম জামা পরলো ও।

প্রণব বল্‌লে—পিছন থেকে একটা মোটর যেন আমাদের অনুসরণ করছে।

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন—অনুসরণ কেন করবে? আর একখানা গাড়ী আস্‌তে নেই? এ পথে ত' কত গাড়ী যায়।

কিন্তু দেখা গেল, গাড়ীখানার মত্‌লব খারাপ, যেখানটা

গভীর খাদ, সেখানে পাশ থেকে এসে ধাক্কা মারতে চায়। যেন অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবার মত্‌লব!

এ গাড়ীর ড্রাইভার চ'টে গেল। নেবে বল্‌লে—কেয়া মত্‌লব হ্যায় তুমারা? চলা যাও আগে।

ও গাড়ীর ড্রাইভার বল্‌লে, নিকাল যানেকো রাস্তা কাঁহা?

আচ্ছা ঔর আগে যাঁহা চওড়াসা সড়ক্ মিলেগা, হুঁয়া তুম্‌কো জায়গা কর্ দেগা। আভি চালাও সামার্‌কে।

গাড়ীতে বোর্‌খা পরা মেয়েরা ছিল।

পাগ্‌লা ঝোরার কাছাকাছি এসে—পথটা যেখানে ভারী বিপজ্জনক—লাগালে চাকায় ধাক্কা! একটা প্রবল ঝাঁকুনীর সঙ্গে গভীর অন্ধকার।

বিশ্বেশ্বর ভরা রিভল্‌বার নিয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

বলা নেই কওয়া নেই, তিনটে টায়ার ফট্ ফট্ ক'রে ফাটালেন।

তার পর বল্‌লেন, থাকো এখানে সারারাত হিমে প'ড়ে। চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি?

বোরখা পরা তিনটি মেয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে যেন আসনের নীচে লুকোতে চায়।

বিশ্বেশ্বরের সন্দেহ হ'ল, ওরা মেয়ে নয়। কিন্তু পরীক্ষা ত করা যায় না!

ড্রাইভারকে বল্‌লেন, কী ভেবেছ তুমি? মানুষ খুন করবে?

সে যেন কত ভয় পেয়ে গিয়ে বল্‌লে—হুজুর আচনক্‌ হো গিয়া। অ্যাক্‌সিডেণ্ট এইসাই হোতে হেঁ।

আচ্ছা লম্বর দেও তুমারা। ব'লে নম্বর নিলেন। তারপর নিজের গাড়ীতে চ'ড়ে বস্‌লেন। গাড়ী চল্‌লো। প্রদীপ ততক্ষণে সহজ হ'য়ে উঠেছে। তার দাহু থাক্‌তে আর ভয় কি? ভরসা পেলেই মানুষের ভয় যায়।

পাগ্‌লাঝোরা ঝর্ণা কোন্ উঁচু থেকে ঝ'রে পড়ছে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। আর কত নীচে যে যাচ্ছে তারও কোনো হিসাব নেই। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে বেশ লাগে।

কিন্তু সময় ত ওদের বেশী নষ্ট করা চল্‌বে না। অনেক রকমের বিপদ আছে।

অনেক উঁচুতে এসে এক জায়গায় দাহু বল্‌লেন—গাড়ীটা রাখো ত, দূরবীণ ক'সে দেখি, ও ব্যাটাদের ব্যাপার কি!

যা ভেবেছি তাই, ব্যাপার সুবিধার নয়। গাড়ীখানাকে ঠেলেঠুলে রাস্তার এক পাশে রেখে ওরা পাহাড়ের গা দিয়ে যে পাকদণ্ডী রাস্তা আছে, সেই সোজা পথে আস্তে আস্তে উঠ্‌ছে গাছ ধ'রে ধ'রে। মতলব কি হে মাষ্টার?

প্রণব বল্‌লে, সম্ভবতঃ ওরা ওপরের রাস্তায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। যতক্ষণে ঘুর্ পথে ঘুরতে ঘুরতে আমরা

ওপরের কার্টরোডে গিয়ে হাজির হব, ততক্ষণে অন্য কোন মতলব বার ক'রে ওরা আমাদের গাড়ী রুখ্‌বে। দিন ত দূরবীণটা। ও কি? বোরখা পরা মেয়ে ত কেউ নেই, সব যে পুরুষ মানুষ! গাড়ীটার ড্রাইভারটা শুধু রয়েছে, আর ত কাউকে দেখ্‌ছি না।

একশো মাইল জুড়ে যেখানে শুধু পাহাড় আর জঙ্গলের রাজ্য এক দিকের আকাশ আড়াল ক'রে, অন্য দিকে দূর সমতলভূমি সবুজ গাল্‌চের মতন প'ড়ে আছে তার নদী অরণ্য গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র নিয়ে—শুধু ডালিয়া ফুলের বর্ণসুষমা, গিরি-প্রসূনের গন্ধ, পাখীর কণ্ঠ আর ঝর্ণার গান, সেখানে সেই অসীম নির্জ্জনতার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের হীনতম কাজে বনলক্ষ্মীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার কথা।

কিন্তু তা হল না। তার বদলে প্রদীপদের ড্রাইভার ভয় পেয়ে গেল। সে আর এগোতে চাইলো না। যা হয় দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিলেই সে ফিরে যাবে বল্‌লে।

দাদু কি খানিকটা চিন্তা করলেন। তার পর বল্‌লেন —গাড়ী ঘোরাও।

নীচে থেকে একখানা ট্রেণ উঠে আসছে। পাগ্‌লাঝোরার কাছে নেমে তাইতে উনি সকলকে নিয়ে উঠ্‌লেন। ট্রেণের সঙ্গে চালাকি করা অত সহজ নয়।

আভিজাত্য রক্ষা

হল্‌দে রঙের গাড়ীখানি নীচের দিকে নেমে গেল।

দাছ্ সমানে চলন্ত ট্রেণ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন।

ওরা বোধ হয় গাড়ীখানাকে ফিরে যেতে দেখেছিল।

ট্রেণ তখন চলেছে ওপরে, মোটরখানা নীচে যাচ্ছে। কখনো দেখা যায়, কখনো আড়াল পড়ে। হঠাৎ স্পষ্ট দেখা গেল ওপর থেকে একখানা পাথর ওরা গড়িয়ে ফেলে দিলে গাড়ীখানার মাথায়, একটু শব্দ পর্য্যন্ত এতদূর এলো না, তারপরেই ট্রেণ আর একটা পাহাড়ের উল্টো দিকে চ'লে গেল, কিছু দেখা গেল না। কুয়াসা আরো ঘন হ'য়ে উঠ্‌লো। ঠাণ্ডাটা আরো বেশী।

দার্জ্জিলিং যখন পৌঁছলো তখনো বারোটা বেলার রোদ্দুর দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকাল সাতটা। হ্যাপি ভ্যালি ভিউ—বাড়ীখানা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, তিনদিকে কোনো পথ নেই। একদিকে ব্রীজ বন্ধ ক'রে দিলে আসা কঠিন! দুর্গ বল্‌লেই হয়।

সেই বাড়ীর দোতলার ঘরের জানলা থেকে সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘা বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদীপের অপূর্ব্ব লাগ্‌লো আর বাবীর জন্যে মন কেমন করতে লাগ্‌লো নতুন ক'রে।

ডারজিলিং কথাটা উচ্চারণ ক'রে তার মনে একটু আভিজাত্য ভাব জাগ্‌লো।

কোথায় গেছলে? না ডারজিলিং, বলবার মতন কথা!

যে-সে যখন তখন কিন্তু ডারজিলিং আসতে পারে না! মাষ্টার মশাই নিজে বলেছেন। তিনিই ত এতখানি বয়সে এই প্রথম এলেন! বলা যেতে পারে এটা রঙের দেশ। নয়ত কি? যেখানে প্রত্যেক বাড়ীটি রঙীন, ফুলগুলি রঙীন, রাস্তা রঙীন, মানুষগুলো এবং তাদের পোষাকগুলো রঙীন, আকাশ রঙীন. পাহাড় রঙীন, সে যদি রঙের দেশ না হয় ত আর রঙের দেশ কোথায়? বর্ম্মায় নাকি আরো রং আছে, জাপানে নাকি তার চেয়ে বেশী রং। কিন্তু এই বা কে পায়! গ্রামে তারা কি দেখে? খালি সবুজ। কলকাতায়? রং-ই নেই! আকাশটা শ্লেটপাথর, রাস্তা ধূলোয় ধূসর। তাই ব'লে বলছে না যে তাদের গ্রামের চেয়ে খারাপ। গ্রামের চেয়ে ভালো স্বীকার করতে হবে বৈকি! তার নাম কলকাতার শহর! পুরোণ হাওড়া ব্রীজ ভেঙে যখন নতুন হাওড়া ব্রীজ হবে তখন একটা দেখবার জিনিস নিশ্চয়ই হবে। তখন হয় ত পুরোণটাকে কেউ পুঁছবেও না। কিন্তু সেটাই কি কম আশ্চর্য্য? ছবিতে দেখা ছিল, এবার সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, বাবী যা দেখেনি।

রাত্রে মনে হল এখানেও সেই গুণ্ডাগুলো ধাওয়া করবে না কি?

মাষ্টারমশাই বলেছেন, অত সহজ নয়! এ বাবা ডারজিলিং। বেশী চালাকী করতে এসো ত নিজেরাই মুস্কিলে পড়বে! আর তাদের বাড়ীতে যে ভূটিয়া দরোয়ান আছে, সে কুকরী নিয়ে

ফেরে, কথায় কথায় পেটে গুঁজে দেয়। তারা হল পাহাড়ী, অসভ্য গোঁয়ার বটে, কিন্তু কুকুরের মতন বিশ্বাসী।

তার ওপর দাদু কোথা থেকে এনেছেন এক বিরাট কুকুর গ্রেট্ ডেন্, বাঘের মতন চেহারা। বাঘের মতন ডাক। চেনবাঁধা অবস্থায় তার রোখ দেখলে লোকে সাত হাত তফাতে যায়। কিন্তু প্রদীপের কাছে? ও যেন একটি ইঁদুর! 'বুলেট্' ব'লে ডাকলেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে! দাদু বলেন—শানাই ওর নাম। বাঙালী নাম বুঝি কুকুরের হয়? ও হ'ল বুলেট্!

দার্জ্জিলিংএর রোদ সত্যি যেন সোনালী, সোনার মতনই ঝক্‌ঝকে। গাছের পাতাগুলি ঠিক্ যেন নীল আর সবুজ মখমল। ফগ্‌ও ঠিক বাংলাদেশের প্রান্তরের কুয়াসা নয়, পাতলা ঝক্‌ঝকে রূপোর পাত। উপত্যকায় ধব্‌ধবে সাদা মেঘ ঘুমিয়ে আছে, যেন রাশি রাশি বকের পালক! পাহাড়গুলি যেন ধোয়া মোছা, বেগুনী রং করা। তার ওপরে হাজারো রঙের বিলাতী ধরণের কাঠের বাড়ীগুলি থাকে থাকে পাহাড়ের কোলে কোলে সাজানো—দূর থেকে দেখো—অবিকল জলছবি। প্রদীপের ভীষণ ভালো লাগে দার্জ্জিলিংকে। শহর চ'লে গেছে কত ওপরে—আর কত নীচে কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে—অত ঘুরে ঘুরে দেখা তার মতন ছোট ছেলের পক্ষে অসম্ভব! এইখান থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে, এই অব্‌জার্ভেটরী হিলের তলা থেকে, এই রেলিংএর ধার থেকে।

তার মতন ছোট ছেলের পক্ষে দামী আল্‌ষ্টারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নেপোলিয়নের মতন এম্‌নি দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই যথেষ্ট কায়দা আছে! আর বেশী সখ ভালো নয়।

ঐত’ কত লম্বা লম্বা মেয়েরা লাল ওভারকোট আর কুচ্‌কুচে কালো আলষ্টার পরা হিল্‌উঁচু সাদা জুতো খট্‌খট্‌ ক’রে পাশ দিয়ে চ’লে গেল বল্‌তে বল্‌তে ‘চমৎকার মুখখানা বাচ্ছাটার, লাভ্‌লি!’ তার মানে কি? তাকে ভালো দেখাচ্ছে।

একটা মেম এসে তাকে আদর করলো, টফি দিয়ে, জড়িয়ে ধ’রে। সাহেবটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগ্‌লো সঙ্গের বুল্‌ডগটার মতন। ওরা ত জানে না তাকে খুন করা হবে!

প্রণববাবুর হাত ধ’রে বার্চ্চহিল পর্য্যন্ত সে গেছ্‌লো আজই সকালে। অনেক লোকজন পথে যাওয়া আসা করছে। তার ভয় করেনি। দরোয়ান ছিল সবসময়।

মাষ্টারমশাই তাকে বললেন—এরকম ক’রে থাকা তোমার চলবে না। এই অমানুষের মতন।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ছোট্ট ফেল্ট্‌ হ্যাট্‌টা নামিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, বুঝ্‌তে পারেনি কথাটা।

মাষ্টারমশাই বুঝিয়ে দিলেন—গায় জোর করতে হবে, মনে জোর আন্‌তে হবে। জিউজিৎস্যুর প্যাঁচ্‌ শিখ্‌তে হবে, কুস্তির প্যাঁচ্‌ও। আক্রান্ত হ’লে কি ক’রে আত্মরক্ষা করতে হবে

তাও তোমার জানা চাই। তোমার দাদু তোমায় ভুল পথে চালাচ্ছেন। তূলোয় ঢাকা আঙুরের মতন রেখে দিলে তুমি চির অসহায় থেকে যাবে।

দার্জ্জিলিংএর রোদে বার্চ্চহিলের মাথায় কথাগুলো যেন দৈববাণীর মত শোনায়।

প্রদীপের মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে।

মাষ্টারমশাই ব'লে চলেন—তোমাকে আমি অভিমন্যু ক'রে তুল্‌ব—মৃত্যুকে যে ভয় করে না। বাংলাদেশের সকল ছেলের যা হওয়া উচিত।

নাম্‌তে নাম্‌তে তিনি বলেন—অথচ হয়নি। ছেলে এদেশে মানুষ হয় না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে ধুতিপরা প্যাণ্টপরা কত ছেলে পাহাড় থেকে নেমে গেল, প্রদীপের চেয়ে অনেক বড়।

মাষ্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রদীপ বল্‌লে—ওরা ?

ওরা কেউ মানুষ হয়নি।—গম্ভীরমুখে তিনি বল্‌লেন।

কেন বল্‌লেন—প্রদীপ বুঝ্‌তে পারলো না। কত ইংরিজি কথা ওরা বল্‌ছে, হোটেলের কথা, হাসির কথা, মজার কথা—ওরা কেউ মানুষ হয়নি ? আশ্চর্য্য !

সেদিন দাদুর সঙ্গে মাষ্টারমশাইয়ের কী ভীষণ তর্ক—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা, যেন রাগারাগি ব্যাপার।

মাষ্টারমশাই বল্‌ছেন—আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি ওকে কি তৈরী করি দেখুন। পাঁচটা বছর আমায় সময় দিন।

দাহ্ বল্‌লেন—তোমার প্ল্যান কি বলো।

আমি ওকে মির্জ্জাপুরে নিয়ে যাব, সেখানে বড় বড় ওস্তাদের কাছে রেখে ওর শরীর শক্ত ক'রে তুল্‌ব।

বলোনা গুণ্ডার কাছে গুণ্ডামি শেখাবে!

তাই যদি বলেন, তাই। ফুলবাবু হ'য়ে ওঠা চল্‌বে না। অজীর্ণয় শরীর জীর্ণ, হাওয়া খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া ছেলে নিজের পক্ষেই একটা ভারস্বরূপ। আমাকে যখন গার্জ্জিয়ান টিউটর করেছেন, ছেড়ে দিন আমার হাতে।

আমি ত জমিদারী ছেড়ে অতদিন বাইরে থাক্‌তে পারব না। দাহ্ প্রতিবাদ করেন।

থাক্‌তে হবে না আপনাকে। আমি সব ভার নিলাম। আপনি কেবল টাকা পাঠিয়ে খালাস।

আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।

প্রদীপের মন খারাপ হ'য়ে যায়। এমন সুন্দর দার্জ্জিলিং ছেড়ে কোথায় নোংরা মির্জ্জাপুর! এত রং এত ফুল এত আলো এত হাওয়া—ভালো ক'রে সব ভোগ করা হ'ল না, এখনি যেতে হবে ছেড়ে দিয়ে?

সে বলে মাষ্টারমশাই, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না

দার্জ্জিলিং ছেড়ে। কী সুন্দর ফুল এখানে, কী চমৎকার পাখী—

পাথরের মতন মুখ কঠিন ক'রে মাষ্টারমশাই জবাব দেন—জীবনটা ফুলের গন্ধ আর পাখীর গান দিয়ে ভরা নয় প্রদীপ, বিশেষ ক'রে তোমার জীবন। একথা বোঝ্‌বার সময় এসেছে। শক্ত কাজ নীরস পথ তোমার জন্যে। আমি শুধু তোমায় পড়াতে আসিনি, গড়তে এসেছি। আমার অপূর্ণ কামনা তোমাকে দিয়ে সার্থক ক'রে তুলব। বাঙালীর ছেলের যা হওয়া উচিত, কিন্তু হয়নি, আমি তোমাকে তাই ক'রে আন্‌ব।

কিছুই বুঝ্‌তে পারে না প্রদীপ। তার ভয় করে। চোখে জল আসে। মন কেমন করে। মাষ্টারমশাইকে ভালো লাগে না।

বিকেলবেলা দাতু বল্‌লেন—প্রণববাবু, আপনি যে ওদের চর নন, তার কি প্রমাণ? ওদের কাছে টাকা খেয়ে যে আমার বংশের শেষ সল্‌তেটিকে নিভিয়ে দিতে যাচ্ছেন না, কী ক'রে বুঝ্‌ব?

প্রণববাবু বল্‌লেন—ছেড়ে দিলাম চাকরী আজই। এই মুহূর্ত্তে।

—ছেড়ে দেবেন এই মাসিক ছশো টাকা আয়, বিনামূল্যে খাওয়া পরা?

—হ্যাঁ! ধূলোর মতন পরিত্যাগ করলাম।

—তাহ'লে ত আর এক রাতও আপনার এখানে থাকা হয় না।

—সন্ধ্যের ট্রেণেই আমি চল্‌লাম। প্রদীপ যে আমার কী, আপনি জানেন না, তাই এত বড় আঘাতটা দিতে পারলেন! এর পরে আর কোনো কথা চলে না।

ব'লে তিনি স্যুট্‌কেশ গোছাতে বস্‌লেন।

দাহু ওঘরে গিয়ে বললেন—আচ্ছা রগচটা লোক! দিই এক মাসের মাইনে বেশী।

এখানে প্রদীপের কি করা উচিত, সে ভেবেই পেলে না।

মাষ্টারমশাই না দার্জ্জিলিং, কে বেশী প্রিয়?

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে ভালো ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

মেঘ আর ফগ্‌, ডালিয়া ফুল আর পাইন গাছ, রঙীন নগরী আর হিমালয় পাহাড় চিরদিন থাকবে—অন্য এক সময়ে এসে ভালো ক'রে দেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রণব বাবুর মতন মাষ্টারমশাই একেবারে চ'লে গেলে তার চেয়ে আফশোষের কী আছে?—মন কেমন করতে করতে এই কথাই প্রদীপের মনে হল।

সে দাহুকে গিয়ে বললে—দাহু আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাব।

বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে দাহু বল্‌লেন—কোথায় যাবে?

যেখানে উনি নিয়ে যাবেন।

দাদু কোনো কথা বল্‌লেন না। অনেকক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেও তাঁকে সাড়া দিতে না দেখে প্রদীপের আর তাড়া দিতে ভরসা হ'ল না, সে নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

মাষ্টার মশাইয়ের স্যুটকেস গোছানো শেষ হয়েছে, প্রদীপ কাছে গিয়ে বল্‌লে, আমাকে নিয়ে চলুন।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—সে হয় না প্রদীপ। পৃথিবীতে তোমার দাদুর চেয়ে তোমার হিতাকাঙ্খী কেউ নেই জান্‌বে। ভুল পথে চল্‌লেও তিনি তোমার শুভ কামনা করেন সব সময়ে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কিছু হ'তে পারে না। আমি চ'লে যাচ্ছি তাঁর ওপর রাগ ক'রে নয়, তোমার ভালো কিছু এ অবস্থায় করতে পারব না ব'লে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে তোমার কল্যাণ করবার ক্ষমতা আমার নেই।

বিদায় নেবার সময়ে প্রদীপের মাথায় হাত দিয়ে তিনি ব'লে গেলেন—আমার পরে যে শিক্ষকই তোমার আসুন, তাঁকে আমার মতনই ভক্তি করবে। আর আমাকে মনে রাখার কোনো দরকার নেই, আমার কথাগুলো মনে রেখে কাজ করলেই হবে।

শহরের আলো জ্বলে উঠেছে, হিম ও কুয়াসায় ঢাকা পথে প্রণব বাবু নেবে গেলেন!

ট্রেণ ছাড়বার আর দেরী নেই—দাদু ঘড়ি দেখে বল্‌লেন।

হঠাৎ পাহাড়ী দরোয়ানের হাতে একখানি চিঠি লিখে ব'লে দিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যেতে।

প্রদীপ তখন শুতে যাচ্ছে, দেখে অবাক্ হল মাষ্টারমশাই ফিরে এসেছেন। দাদুর মত বদ্‌লেছে। বল্‌লেন—চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা আশা করি মঞ্জুর করেছ মাষ্টার। প্রদীপকে ছেড়ে দিলাম তোমার হাতে। ভেবে ভেবে আমি আর পারি না।

পরদিন দিনের সূর্য্য পশ্চিমে চ'লে পড়বার আগে শিলিগুড়ির প্রান্তরে ওরা নেমে এলো। তারপর উত্তরে এবং পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে, তারপর পশ্চিমে কত গ্রাম কত প্রান্তর দেখে গঙ্গায় ষ্টীমার ক'রে ওপারে অন্য রেললাইনে চ'ড়ে গুরু শিষ্য আর পার্ব্বতী পৌঁছে গেল বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে—

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে জাহ্নবীর গেরুয়া রঙের বিস্তৃত বালুচরে ঝিলিক্ মারা রোদ প্রদীপের বিষণ্ণ মন প্রসন্ন ক'রে তুল্‌লো।

বিন্ধ্যাচল—মাইলের পর মাইল ছড়ানো। মাইলের পর মাইল সমতল ভূমি তার শিখরে। অরণ্যের পর অরণ্য, গুহার পর গুহা, ঝর্ণার পর ঝর্ণা এবং গ্রামের পর গ্রাম।

সেখানে সে ঘোড়ায় চড়া শেখে, কুস্তি শেখে মির্জ্জাপুরী ওস্তাদের কাছে। সাঁতার শেখে বিন্ধ্যেশ্বরীর মন্দিরের ঘাটে। পড়া তৈরী করে দুবেলা নিয়মিত।

# আড়িশাড়ু বক্সা

বিন্ধ্যাচলের লোকেরা কেউ ওকে জমিদারের নাতি ব'লে চেনে না, জানে গরীবের ছেলে ব'লে। এমন কি পোষাক আর ভাষায় বাঙালী ব'লে চেনা যায় না, মনে হয় হিন্দুস্থানী। সে ছাতু খায়, চানা খায়, বাদাম খায়, কাঁচা ভুট্টা খায়, দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে খায়।

সে গাছে চড়ে, লাঠি ঘোরায়, বন্দুক ছোঁড়ে।

সূর্য্য ওঠার অনেক আগে তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। অন্ধকারের বুক থেকে আকাশ ও মাটির ছবি ধীরে ধীরে আলোতে কেমন ক'রে ফুটে ওঠে, স্বপনের রাজ্য থেকে জাগরণের দেশে আসা যায়, তার অনুভূতিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

নীচে দূরে গঙ্গা ধূ ধূ বালির চড়ায় যেন লক্ষ্মীর আলপনা এঁকে দিয়েছে। বিন্ধ্যাচলের পাহাড় থেকে পাহাড়ে সেই গঙ্গার হাওয়া ব'য়ে যায়।

যেদিন মেঘ ক'রে ওঠে, কন্‌কনে বাতাস চলে, ঝরঝর বৃষ্টি নামে, গাছগুলির রং নানা রকমের দেখায়, সেদিন শুষ্ক কঠিন দেশে যেন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। সেদিন ঝর্ণাগুলো ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন গঙ্গার সমস্ত বালুচর ডুবে যায় রাঙা জলে।

এক বছর বাদে প্রদীপকে আর চেনা যায় না। শরীর তার শক্ত হ'য়ে গেছে, মনে এসেছে সাহস। দুপুরের চড়চড়ে রোদ

মাথায় নিয়ে, কিম্বা বৃষ্টিঝরা অন্ধকার দিনে, সাপে ভরা রাতের রাস্তায় মাইল পার হয়ে যেতে পারে সে অনায়াসে।

একদিন—তখনো উষার আলো জাগেনি ভালো ক'রে, বিন্ধ্যাচলের মাথায় সমতল প্রান্তরে সেই অস্পষ্ট আলোয় পাৎলা অন্ধকারে প্রদীপ বেরিয়ে পড়েছে একলা! খানিকটা গিয়ে দেখলে আশ্চর্য্য জিনিস—দলে দলে হরিণ চরছে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। কোনো কোনোটার শিং ছোট গাছের শাখা প্রশাখার মতন নীচে-নেমে-যাওয়া-আকাশের গায়ে ফুটেছে, কোনো কোনোটার বাদামী রং অল্প আলোয় চক্ চক্ করছে। যেই না ওর সাড়া পাওয়া, অম্নি দলের প্রথমটা দিয়েছে লাফ, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হরিণের পাল যেন সোণালী তরঙ্গের মতন ফুলে উঠে সবুজের সমুদ্রে ডুবে গেল।

চল্‌তে চল্‌তে সে পেল একটা সিঁড়ি, নেমে গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে পাতালপুরীর দিকে। অনেক নীচে ঘন অরণ্যের দিকে। অনেক নীচে ঘন অরণ্যের মাথা, সেইদিকে চেয়ে সে নেমে চল্‌ল। শুনেছে, কোথায় ডাকাতে কালী আছে, হাঁ-করা ভীষণ মুখ, সেই মুখের গহ্বরে একশোটা পাঁঠার রক্ত ঢেলে দিলে নিঃশেষে তলিয়ে যায়। ঐ দিকে ঐ গহন বনের মধ্যে, নির্জ্জন নিরালায়। আড়াই শো সিঁড়ি পার হ'য়েও মন্দিরের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আরো আরো নীচে নাম্‌তে হবে। ভোরের পাখী তখন ঘুম ভেঙ্গে একে একে ডেকে উঠছে।

আভিশপ্ত রত্ন

ক্রমশঃ অরণ্যের মাথা দেখা গেল, দীর্ঘ বনস্পতির চূড়াগুলি, ক্রমশঃ আম জাম কাঁঠালের সারি। ক্রমশঃ লতাপাতায় আচ্ছন্ন অন্ধকার বনভূমির মধ্যে যেন প্রদীপ ডুবে গেল। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটি, পাতা থেকে তখনো শিশির ঝ'রে পড়ছে, তখনো আকাশের আলো সেখানে এসে পৌঁছয়নি। কালীবাড়ীতে তখনো প্রদীপ জ্বলছে।

ভিতরে সে প্রবেশ করলো। অন্ধকারের মধ্যে মূর্ত্তি, যেমন শুনেছে, সেই রকমই বটে। প্রণাম ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে অঙ্গনে এক ভীষণ হাড়িকাঠ। দূর অতীতে গহন অরণ্যের মধ্যে কত নরবলি হ'য়ে গেছে ওখানে, গেছে কত অসহায় দুর্ব্বলদের প্রাণ নিষ্ঠুর মানুষের হাতে! মৃত্যু যে জল্লাদদেরও ছেড়ে দেয়নি, বাতাসে যেন তাদের নৃশংসতার স্মৃতি ভেসে আসে।

পথ আরো আরো নীচে নেমে গেছে। বিন্ধ্য পাহাড়ের সানুদেশ সেখানটা। ওপরে চূড়ায় রাঙা রোদ এখানে গাছের মাথাগুলোকে রঙীন ক'রে তুলেছে। নীচে আলো হয়ত দুপুরের মাঝামাঝি আস্‌বে।

জায়গাটা প্রদীপের ভালো লাগ্‌লো। বিন্ধ্য পাহাড়ের নীচে নীচে কত জায়গায় এম্‌নি কত রহস্য লুকানো আছে। খানিকটা গিয়ে একটা পরিষ্কার বাঁধানো কূয়া, বস্‌লো তার ধারে। সেখানটা একটু ফাঁকা।

একে একে লোকে জল নিতে আসে। কেউ স্নান করে, কেউ মুখ ধোয়। হঠাৎ একটা ছোক্‌রা গোছের লোক জিগ্যেস্ করলে—আপ্ কাঁহা রহেতে হেঁ?

—পাহাড় পর্।

—কাঁহা মুলুক আপ্‌কা?

বলে প্রদীপ—গাজীপুর।

—আপ্ গাজীপুরওয়ালা? কোন্ গাঁও?

—চিতুপুর। তুম্ কাঁহা রহ্‌তে হো?

—হামারা বালিয়া জিলা ভাই, বনারস্ সে আগে। আপ ত মেরা দেশোয়ালি ভইল্।

বেশী কথা না বাড়িয়ে প্রদীপ ওপাশে উঠে গেল। অনর্গল মিছে কথাগুলো বলেই বা কী ক'রে?

লোকটা আর একটা লোকের কাছে স'রে গিয়ে বললে—ই কহ্‌তে হেঁ গাজীপুর রহ্‌নেওয়ালা, হাম্ শোচ্‌তে হেঁ এইসা কভি নেই হো সক্‌তে হ্যায়। উ হ্যায় বাংগালী।

সে লোকটা জবাব দিলে—বাংগালী কভি এইসা পায়জামা পিন্‌তে হেঁ? কেয়া কহ্‌তে হো ভাই? যো হোয়, সো হোয়, হামারা ক্যা?

প্রদীপ ওপরে উঠে এলো।

মাষ্টারমশাই বল্‌লে—আদা ছোলা খাওনি, মেহনৎ করোনি ডন বৈঠক্ দিয়ে! কোথায় ছিলে?

যা যা হয়েছে, প্রদীপ বল্‌লে।

প্রণব বল্‌লে—আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও বেরিয়ো না। সময় সময় মিথ্যে কথা বল্‌তে হয়, কিন্তু কাঁচা কথায় বিপদ্ বাড়ে। কে কি মৎলবে তোমায় কোন্ কথা জিগ্যেস্ করবে, সব ধরতে পারা তোমার বয়সে সম্ভব নয়। চলো আজ পাখী শিকারে যাই।



দেখলেন তীক্ষ্ণ ছোরা গোঁজা ( পৃঃ ২৯ )

দীর্ঘকাল নাতিকে না দেখে বিশ্বেশ্বরের মন হুহু করে

চিঠিতে খবর পান, মনিঅর্ডারে টাকা পাঠান, কিন্তু একবার দেখ্‌তে যাবার নাম করলে প্রণব নিষেধ করে—এখনো নয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি বেরোলেন। মাছুরা, রামেশ্বর. তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, কুম্ভকোনম্, কন্যাকুমারী ঘুরেও মন স্থির হ'লনা। হয় কখনো? প্রদীপের কাছে যার মনটি প'ড়ে আছে?

একবছর কেটে গেছে, আরো একবছর কাট্‌লো।

একদিন তিনি কোনো নিষেধ না শুনে উত্তর ভারতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। এলেন কাশীতে। সেখানে ছুদিনও থাক্‌তে পারলেন না। একদিন বাসে চ'ড়ে নাম্‌লেন মির্জ্জা-পুরের ওপারে।

অপরাহ্ণের আলো তখন ম্লান হ'য়ে আস্‌ছে। ঝুন্‌ঝুন-ক'রে এক এক্কা এসে নীচে দাঁড়ালো, ডাক্‌বাংলো থেকে দেখতে পেয়ে প্রদীপ বল্‌লে—কে এলো মাষ্টার মশাই।

প্রণব বল্‌লে, কত ভাড়াটে আছে, তাদেরই হয়ত কেউ। চলো আমরা বাড়ী ফিরি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা, দাছু এসে হাজির।

দাছু বলেন—দাছু, প্রদীপ বলে—দাছু। ছুজনে ছুজনকে জড়িয়ে ধরে, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য খানিকক্ষণ।

প্রদীপের চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে তিনি খুশী হলেন ভারী। কল্পনাই করতে পারেন নি। পাথরের মতন

শক্ত হয়ে গেছে ছেলে। সে কথা মুখে কিন্তু উচ্চারণ করতে পারলেন না, পাছে নজর লেগে যায়।

প্রণব বল্‌লে—কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না আপনি। তুবছর আমরা এখানে আছি, কেউ জান্‌তে পারেনি আমাদের পরিচয়। আপনি এসেই বোধহয় সর্ব্বনাশ হ'ল।

—কিসের সর্ব্বনাশ?

আরেকটা এক্কার ঝুন্‌ঝুন-আওয়াজ শুনিয়ে প্রণব বল্‌লে—বুঝতে পারলেন? ঐ? এলো আপনার সঙ্গে সঙ্গে চর।

সাবধানে থাকো তোমরা।

সাবধান অবশ্য ওদের হ'তেই হ'ল। বিন্ধ্যাচলের মাথায় অনেক অপরিচিত মুখ এদিকে ওদিকে দেখা গেল সকাল থেকেই।

সেদিন আবার ওদের টাণ্ডা ফল্‌স্‌ যাবার কথা ছিল। ভয়ে ত যাওয়া বন্ধ করা যায় না? তুখানা টাঙ্গা তুপুরবেলা আনানো হ'ল।

একটাতে দাতু আর পার্ব্বতী, আরেকটাতে গুরু শিষ্য। 'টাঁড়োয়া দরী' দেখতে ওরা চল্‌লো, যেমন সকলে যায়।

আখড়ার কাছে এসে একবার ওস্তাদজীকে খবর দেওয়া হল, তিনি মুরুব্বিয়ানা ক'রে বললেন—কেয়া? ডর লাগ্‌তা হ্যায়? ডর্‌নেকো কাম নেহি।

নির্জ্জন দীর্ঘপথ বিন্ধ্যগিরি শ্রেণীর গায়ে গায়ে। ঝর্ণা যেখানটা ঝ'রে পড়ছে, সেখানটা আরো উপভোগ করবার

জিনিস। ঘুরে ফিরে খানিকটা দেখা হ'ল। জলখাবার আনা হয়েছিল, ব'সে ওরা খাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো।

দাত্বু চেয়ে দেখ্‌লেন।

হাতের লাঠির দিকে চেয়ে প্রণব বল্‌লে—আস্‌তে দিন যে আসুক্। কী প্রদীপ? ভয় করছে?

প্রদীপ বল্‌লে, লাঠি আমারো আছে।

খাবার শেষ হবার আগেই কিন্তু লাঠিয়ালরা ওদের ঘিরলো, মোটর থেকে যারা নেমেছিলো। এদেরও লাঠি ঘুরে উঠ্‌লো।

চক্ষের নিমেষে। বিত্যুৎগতিতে।

প্রণব তুজনকে কাৎ করলে।

ছেলেমানুষ প্রদীপও একজনকে।

চতুর্থ জন প্রণবকে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো, তিনজনে মিলে প্রদীপকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলেছে। ফিরে দেখ্‌বার আগে মোটরে ষ্টার্ট দিলে। মরিয়া হ'য়ে প্রণব তার বিপক্ষের বুকে প্রচণ্ড ঘা বসাল।

ওরা সাতজন এসেছিল।

মোটর তখন ধুলোর আড়ালে মিলিয়ে গেছে। যে তুটো মাথা ফেটে পড়েছে সে তু'টো মুসলমান। প্রদীপ যাকে জখম করেছে, সে হিন্দুস্থানী। শেষ যেটাকে মাটিতে ফেলেছে, সেটার জাত্ বোঝা মুস্কিল চেহারা দেখে। কোনটারই কথা

বল্‌বার ক্ষমতা নেই, কাৎরাচ্ছে করুণভাবে। একটা জল চাইলে।

প্রণব তখন ছুটে বেরিয়ে পড়লো হতভম্ব বিশ্বেশ্বরবাবুকে সঙ্গে টেনে সাদা ঘোড়ার টাঙ্গায়।

কথা বল্‌বার মতন অবস্থা নয়, তবু বল্‌লে, আপনার জন্যেই এই সর্ব্বনাশটা ঘট্‌লো, কেন আপনি এলেন? আমরা বেশ ছিলাম।

বিশ্বেশ্বরবাবু কথা বল্‌লেন না। তাঁর বলবার কিছু নেই তাঁর মনে হল তিনিই যেন ওর দুগ্রহ। জীবনে যত পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হল না?

মোটরে ওঠবার সময়ে শেষ চীৎকার শুনেছেন তিনি প্রদীপের—দাদু ও দাদু!

অসহায় দাদু কিছুই করতে পারলেন না। বন্দুকটা সঙ্গে থাক্‌লে এখনো সোজা হ'য়ে ছুঁড়তে পার্‌তেন, তাতে টায়ারটা অন্ততঃ ফাট্‌ত।

আর বন্দুক ত তুলে রাখবার জন্যে হয়নি, এম্‌নি চোর ডাকাতদের শেষ করবার জন্যেই সরকার থেকে দেওয়া হয়; গভর্ণমেণ্টের দায় কমে, ঝঞ্ঝাট কমে।

আফ্‌শোষ ক'রে লাভ নেই এখন। দীর্ঘ ধূলিধূসর বঙ্কিম পথ দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত শূন্য পড়ে আছে, মোটর দূরের কথা, জনমানবের দেখা নেই। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা প্রহরীর মতন নিশ্চল হ'য়ে আছে।

দূরে দেখা গেল, একটা গ্রামের ধারে মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, তখনি ধূলোর ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন ক'রে মিলিয়ে গেল।

কাছাকাছি এসে প্রণব দেখ্‌লে ওস্তাদ্‌জীর লোকেরা তৈরী ছিল, পথের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে মোটর আট্‌কেছিল, কিন্তু এরা মাত্র দুজন, তাদের কাছে পারলোনা। গ্রামের লোক ডাক্‌তে ডাক্‌তে পালালো।

ওস্তাদ্‌জীও মির্জ্জাপুরের পথে দাঁড়িয়েছিলেন, খুব দুঃখ করলেন, আফ্‌শোষ করলেন কেন দল ভারী ক'রে লোক পাঠাননি। এত সাহস হবে তাদের, তিনি ধারণাই করতে পারেননি। তাঁর এলাকা থেকে তাঁর সাক্‌রেদকে নিয়ে যাবে! যাইহোক্‌, তিনি ব্যবস্থা করছেন। দিকে দিকে চর পাঠাচ্ছেন। কিন্তু টাকার দরকার।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, টাকার জন্যে ভাব্‌বেন না।

কিন্তু টাকার জন্যে ভাব্‌তে হ'ল।

পরদিন একখানা খাম এলো ডাকে—এলাহাবাদ ফোর্টের মধ্যে যেখানে অক্ষয়বট আছে সেখানে কোনো লোককে আশি হাজার টাকা নগদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনদিন ভাব্‌বার সময় দেওয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, আশি হাজার টাকা বড় বেশী হ'য়ে গেল না? এখন কোথায় বা পাই অত টাকা এখানে?

প্রণব বললে, তার চেয়ে বলুন কেনই বা দিতে যাব ওদের?

কিছু করতে হবে না। আমি একলাই গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করব শুধু হাতে।

শুধু হাতে? পুনশ্চ ব'লে তলায় কি লিখেছে দেখোনি? 'টাকা না আনিলে কিম্বা পুলিশে খবর দিলে প্রদীপেরই বিপদ জানিবেন।'

ওতে ভয় খাবার কিছু নেই। আমি আজই এলাহাবাদ



একখানা পাথর ওরা গড়িয়ে ফেলে দিলে (পৃঃ ৪২)

চল্লুম

প্রয়াগ ঘাট। যমুনার কূল থেকে পরে নৌকো ছাড়ছে যাত্রী নিয়ে। প্রণবও উঠে বস্‌লো, দু' পয়সা দিলে সঙ্গম পর্য্যন্ত যাওয়া আসার দরুণ। গঙ্গার সাদা জল যেখানে যমুনার কালো জলের সঙ্গে মিশেও মিশ্‌তে পারছেনা, সেইখানে নৌকো থেকে নেমে জলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে প্রথমটা প্রণবের একটু ভয় হ'ল, ডুব-জল নয়ত? না, দেখে একটি ছোট ছেলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

স্নান ক'রে এক ঘটি জল নিয়ে সে লাল কেল্লার দরজায় এসে দাঁড়ালো।

অক্ষয়বট দেখ্‌তে দলে দলে লোক চলেছে।

অন্ধকার ছোট ঘরের মধ্যে রূপো-বাঁধানো-গুঁড়ি ছোট্ট একটি বটের চারা ওপরে রৌদ্রের দিকে শাখা বিস্তার করতে চাইছে। সেখানে ভিড় কম ছিলনা। প্রণব অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো।

নেহাৎ ক্ষীণকায় একটি লোক কাছে এসে জিগ্যেস করলে—প্রণববাবু, টাকা এনেছেন?

অত টাকা একসঙ্গে আনা যায়? অর্দ্ধেক এনেছি। বাইরে পুঁট্‌লীগুলো রেখে আস্‌তে হল, গোরা সিপাহীর হাতে দিয়ে এসেছি।

কি, আমাকে বন্দী করতে চান নাকি? মনে রাখ্‌বেন, যে মুহূর্ত্তে আমায় ধরিয়ে দেবেন, সেই মুহূর্ত্তেই প্রদীপের

বিপদ।

কোথায় আছে, তোমাকে যন্ত্রণা দিয়ে সে খবরটা আদায় করতে পারব ত ?

খবর আদায় ক'রে কোনো লাভ হবে না। গিয়ে দেখ্‌বেন হয়ত তাকে হত্যা করা হয়েছে। বুঝ্‌তেই পারছেন, যারা নিয়ে গেছে, তারা শুধু টাকাই চায়, দয়ামায়া ব'লে তাদের মনে কিছু নেই !

চলো ফোর্ট থেকে বেরোনো যাক্‌।

গেট্‌ থেকে একটা পুঁট্‌লী হাতে নিয়ে বেরোবার সময় প্রণব বল্‌লে, যে টাকা আছে এতে, এখানে নেবে ?

এখানে কি নেওয়া যায় ? চারদিকে সেপাইশান্ত্রী ? চলুন্‌ ঐ নদীর দিকে নির্জ্জন জায়গায়। অর্দ্ধেক টাকা কিন্তু চল্‌বে না। আমি নিতে পারব না।

বালির চরে তারা গিয়ে দাঁড়ালো. ধারে কাছে কোথাও লোক নেই, দূরে দূরে দু'একজন যাচ্ছে।

প্রণব দেখ্‌লে, লোকটার মুখ রুক্ষ কঠিন, নিষ্ঠুর তার দৃষ্টি। তবু বল্‌লে, ছেলেটাকে বাঁচানোর সম্বন্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো না ?

না, তা'হলে আমার বিপদ্‌ বাড়ে। আর বিশ্বাস ? কাকে করবেন আপনি ! জানেন, ওস্তাদজী পর্য্যন্ত টাকা খেয়ে আপনাদের বিপক্ষে গেছে ?

তা কি সম্ভব ?

টাকায় সব সম্ভব। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি টাকাই আনেননি। ভালো করলেন না। আর দুদিন দেখে ওরা চ'লে যাবে অনেক দূরে, আবু পাহাড়, কিম্বা আসাম। তখন কোনো সন্ধানই পাবেন না। এই ব'লে গেলাম।

দ্রুতপদে সে চ'লে গেল।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য জিনিস ঘটে, তার মধ্যে একটি প্রদীপ আজ প্রত্যক্ষ করলো।

যে বাড়ীতে ওকে তিন তলায় মুখ বেঁধে বন্দী ক'রে রেখেছিল, তার জান্‌লা থেকে দেখ্‌লে সাম্‌নের বাড়ীতে বাবী— তার ছেলেবেলার বন্ধু বাবী, সিঁথেয় সিঁদুর, দিব্যি বৌটি !

চেঁচিয়ে একবার বাবীকে ডাক্‌তে পারলে হয়, কিন্তু মুখ বাঁধা, আর বাবীও সিঁড়ির রেলিং ধ'রে নেমে যাচ্ছে।

বাবী এসেছিল তার বন্ধু শীলার বাড়ী। রাস্তায় তার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, গিয়ে উঠ্‌লো। তার শ্বশুর কমলবাবু এলাহাবাদের সবচেয়ে বড় উকীল, আর স্বামী তপন পুলিশের সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর।

শুধু এখানে এসে নয়, অনেকদিন থেকেই বাবীর প্রদীপের কথা মনে পড়ে, খবর না পেয়ে মন কেমন করে। কিন্তু উপায় নেই খবর নেবার, যে বুড়ো দাদু ! সে নাকি কাউকে কিছু বল্‌বে ?

ইচ্ছে ছিল তার প্রদীপের কাছে দার্জ্জিলিংএর গল্প শুন্‌বে—ঐখানে যাওয়া পর্য্যন্ত তার জানা ছিল। ইচ্ছে ছিল তার, প্রদীপকে এলাহাবাদের কথা শোনাবে, কদিনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছে।

তাই যখন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শুক্‌নো হাওয়া পিচ্‌ঢালা পথের ওপর এসে পড়ছে ঝাউগাছের পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে, তখন ব্রাউন রংএর কারে আরাম ক'রে ব'সে অনেক দিনের পুরোণ বন্ধুকে মনে করা ভালোই লাগ্‌বার কথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস—কোথায় কে চ'লে যায়!

ছোটমেয়ের মনে এই করুণ আর্ত্তনাদ, এই গভীর তত্ত্বকথা, বড় মেয়েদের চেয়ে যে কিছু কম ক'রে বাজে তা নয়! বরঞ্চ ছোটমেয়েদের চোখের পাতা বড় মেয়েদের চেয়ে বেশী ক'রে ভিজে ওঠে আরো সহজেই!

চেয়ারে মুখ ঘ'সে ঘ'সে অনেকক্ষণ পরে মুখের বাঁধন প্রদীপ যখন আলগা করলো, তখন বাবী তার বাড়ীতে পৌঁছে গেছে। গিয়ে বিকেলবেলার স্নান সেরে চায়ের টেবিলে বস্‌বার আয়োজন করছে।

তবু প্রদীপ জান্‌লার কাছে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লো—বাবী! বাবী!

কোথায় বা বাবী? সে বাড়ীতে দুটি মেয়ে থাকে শীলা

আর বুলা তাদের বাবা আর মার সঙ্গে। সকলেই গেছে লক্ষ্ণৌএ বেড়াতে, বাবীও এসে শূন্য বাড়ী দেখে ফিরে গেল।

প্রদীপের হাত পা তখনো বাঁধা। তিন চার বার ডেকে যখন কোনো সাড়া পেলেনা, আর বুঝ্‌লে বাড়ীটা খালি, তখন সে হাল ছেড়ে দিলে।

দুদিন ধ'রে তার শরীরের ওপর দিয়ে ত কম ধস্তাধস্তি যায়নি! জখম হয়েছে, জখম করেছে!

সে প্রদীপ আর নেই। সেই ভয়ে মুষ্‌ড়ে পড়বার ছেলে! যতই না বিপদ ঘটুক্, মাথা স্থির রাখ্‌তে সে খুব পারে, এখন যে তার গায়ে জোর এসে গেছে! গায়ের জোরেই ত' মনের জোর। আর মনের জোর থাক্‌লে গায়ের জোরের অভাবই হয় না। প্রদীপ আজ মরীয়া।

তবু যতই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌তে লাগ্‌লো, ততই যেন তার মনে নামলো ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া।

অন্ধকারের মধ্যেই চিরঞ্জীলাল এলো তার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে। বলে গেল তাকে আবুপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হবে। তার দাদু যদি আশি হাজার টাকা না দেন, ত না খাইয়ে শুকিয়ে তাকে মারা হবে।

কি ভাগ্যি, অন্ধকারে লক্ষ্য করলোনা প্রদীপের মুখ খোলা। প্রদীপও সেই ভয়ে কোনো জবাব দিলেনা, নইলে জবাব দেবার জন্যে তার মুখ যাকে বলে নিস্‌পিস্ করছিল। বল্‌তে

ইচ্ছে হচ্ছিল—টাকা দেবে না আরো কিছু!

কিন্তু খানিক পরে খাবার নিয়ে এলো যে লোকটা—দুষ্‌মন গোছের লোকটা আলো নিয়ে—সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—মুখের বাঁধন খুলে গেছে? তা যাক্ গে। ধারে কাছে কোথাও বাড়ী নেই, একখানি যা আছে, তাতে লোক নেই। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কোনো আশা নেই।

খাবার আর কি? একবাটি দুধ আর সন্দেশ।



লাঠিয়ালরা ওদের ঘিরলো ( পৃঃ ৫৮ )

বল্‌লে—আমি ধরছি, খেয়ে ফ্যাল্।

প্রদীপ বল্‌লে—আমি খাচ্ছি, দিয়ে ফ্যাল্। বিষটিস্ মিশোশ্‌নিত ?

বিষ দুদিন বাদে মেশাব।

দুদিন বাদে আর সময় পাবি কি ? তখন আমিই তোদের ফাঁসীকাঠে চড়াব।

বলিস্ কিরে স্যাঙাৎ ? ব'লে লোকটা চতুষ্পাটি দাঁত বার ক'রে হ্যা হ্যা ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

রাতটা যে কী কষ্টে কাট্‌লো, বলবার নয়। প্রদীপের কেবলি মনে হচ্ছিল, চরম দুঃখের রাত্রির পরে সুখের প্রভাত আসে—প্রণববাবুর কাছে শুনেছে যে কথা।

তার মন যেন গান গেয়ে উঠ্‌ছিল—

দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমায় নাহি ডরিব হে।

ভোর তখনো হয়নি—রাত্রি শেষের প্রহর। হঠাৎ পাশের বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠ্‌লো, ফিরেছে ওরা লক্ষ্ণৌ থেকে।

সিঁড়িতে লোকজনের আনাগোণার শব্দ, জিনিসপত্র এখানে ওখানে রাখার আওয়াজ।

ক্রমশঃ তিন তলায় প্রায় ওর ঘরের সাম্‌নাসাম্‌নি নারী-কণ্ঠের কলশব্দ।

আকাশে তখনো শুকতারা জ্বল্‌ছে।

প্রদীপ ডাক্‌লো—বাবী!

শীলা বল্‌লে বুলাকে—কে যেন বাবীকে ডাক্‌লো! পাশের বাড়ীতে কেউ বাবী আছে নাকি? বাবী নাম কি এত সাধারণ হ'য়ে গেছে? বাবী ত জানি একজন।

আমি সেই বাবীকে ডাক্‌ছি। বল্‌লে প্রদীপ।

বারান্দায় মুখ বার ক'রে শীলা বল্‌লে—কে আপনি?

আমি প্রদীপ, বাবীকে ডেকে দিন্।

বাবী ত' এ বাড়ীতে থাকে না!

যেখানে থাকে, খবর দিন্। বলুন প্রদীপ ডাকাতের হাতে পড়েছে।

ডাকাত? ওবাড়ীতে ডাকাত কোথায় এলো? ওটা ত' আলিমের বাড়ী। লোকটা অবশ্য খুব পাজী। কিন্তু ওখানে আপনি এলেন কি ক'রে?

অত কথা বল্‌বার আমার সময় নেই। যে পাহারা দিচ্ছে, এখনো তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ জেগে উঠ্‌লে মুস্কিল। আপনি শুধু বাবীকে খবর দিন্। সেই আমায় বাঁচাতে পারে। ফোন্ আছে ত' আপনাদের বাড়ীতে?

তা আছে। কিন্তু এই ভোররাত্রে ফোনে বাবীকে ডাক্‌ব? আলো হ'তে দিন্।

আলো হ'তে দিলে দেরী হ'য়ে যাবে।

আমার বাবাকে জানাই ?

কোনো লাভ নেই।

বাবী ছেলেমানুষ, পরের ঘরের বৌ।

হোক্ গে, সেই পারবে শুধু আমাকে বাঁচাতে, আর কেউ না। তাকেই খবর দিন্।

কি বল্‌ব ?

বলুন, তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে।

এই বল্‌লেই হবে ?

এই বল্‌লেই হবে।

কত যে ছেলেমানুষ প্রদীপ এই কথাতেই বোঝা গেল। পৃথিবীতে প্রদীপরা বিপদে পড়ে, কিন্তু বাবীরা সব সময়ে এসে পড়তে পারে না, যতই কেন না অনেক দিনের ভাব থাক্! বাবীরা ত' প্রদীপদের মতন স্বাধীন নয়। তা হোক্, কিন্তু বিপদে প'ড়ে প্রদীপের বাবী ছাড়া আর কোন কথা মনে পড়লো না।

শীলারা অত ছেলেমানুষ নয়। তাদের বাবাকে সব কথা বল্‌লে আগে। তিনি লোকজন নিয়ে গিয়ে দেখ্‌লেন, সদর দরজায় তালা আঁটা। অথচ তিনতলায় লোক রয়েছে। আলিমের বাড়ী জাল জুয়াচুরীর জন্যে কুখ্যাত। এটা আগে শরৎ সরকারের ছিল। সে তার বড় ভাজকে ঠকিয়ে এটি আত্মসাৎ করে। তারপরে বিপদে প'ড়ে বেচে দেয় আলিমকে,

হিন্দুমুসলমান মাড়োয়ারী বারেন্দ্র রাঢ়ী কয়েকটি বদ্‌মাইস্ লোক মাঝে মাঝে এখানে এসে নানারকম ব্যবসা চালায়—জাল নোট থেকে জাল দলিল তৈরী পর্য্যন্ত। দু একটা দল ধরা পড়েছে। আজ আবার কী নতুন কুকীর্ত্তি করছে, শিবকালীবাবু ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

শীলা বুলাকে বল্‌লেন, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শীলা বল্‌লে—কিন্তু বাবা, ছেলেটি বলেছে বাবীকে খবর দিতে। তাই দাও না। বাবীর স্বামীও ত পুলিশের লোক। তিনি এসে যা হয় করবেন!

সত্যি কথা। শিবকালীবাবুর মনে হল'—মন্দ বলেনি। বল্‌লেন—করো তোমরা ফোন। আর দেরী কোরোনা। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, তবু বাবীর ঘুম ভাঙেনা।

এ পাশ ওপাশ ক'রে স্বপ্নের জের আরো খানিকটা টানতে চায়।

ঘুমের ঘোরে একটি সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে আজ সে প্রদীপকে দেখেছে, চঞ্চল ক্লান্ত প্রদীপ। কী যেন তাকে বল্‌তে চায়, অথচ কথা যেন তার বন্ধ হ'য়ে গেছে। একটা চমৎকার ফুল-বাগানের পাখীর গানের মধ্যে যে স্বপ্ন আরম্ভ, তার এমন পরিণতি কেন?

চম্‌কে উঠে পাশ ফিরে সে আর একটা ভালো স্বপ্ন দেখবার আয়োজন করছে, সেই ভালো স্বপ্নটা কিছুতেই পরিষ্কার হ'য়ে ফুটছে না। বাধার পর বাধা। স্বপ্নে আবার এলো প্রদীপ, একটা নদীর ওপার থেকে তাকে ডাক্‌ছে, কিছুতেই যাবার উপায় নেই। ঝড়ে নদী ফুলে উঠেছে, বাবীর মন দুলে উঠেছে, কিন্তু প্রদীপ তবু চেঁচিয়ে চলেছে।

ঘরের কোণে ফোন্ বেজে উঠ্‌লো।

তপনের খাটের কাছে। সেই উঠে আগে ধরলো। বল্‌লে—কে ?

উত্তর এলো—আমি শীলা, বাবীকে চাই।

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার তাকে বল্‌ব।

ও, দিচ্ছি। বাবীকে ডাক দিলে তপন।

ফোন ধ'রে বাবী শুনলে—আমি শীলা, বাবী শোন্, আমাদের পাশের বাড়ীতে সেই নোটোরিয়াস্ বাড়ীতে প্রদীপ ব'লে একটি ছেলে বন্দী হয়ে আছে—

বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো বাবী—প্রদীপ ?

হ্যাঁ, সে বল্‌ছে তোকে বল্‌তে—তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে। কে রে তোর ? ভাই টাই কেউ বুঝি ?

ভাইয়ের চেয়েও বেশী। আমার অনেক কালের বন্ধু। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

তখনি তপনকে ডেকে বল্‌লে, প্রদীপ বিপদে পড়েছে, সেই সেই প্রদীপ, যার কথা তোমায় অনেক বলেছি। বন্দী আছে শীলাদের পাশের বাড়ী। উদ্ধার করো তাকে। গাড়ী বার করো।

তপনের বয়স এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই হয়েছে। সে অত ভাবপ্রবণ নয়। বল্‌লে—দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়োনা। থানায় ফোন ক'রে সব ব্যবস্থা করছি, ব'লে দিচ্ছি বাড়ীটার ওপর নজর রাখ্‌তে। যেন নিয়ে স'রে না পড়ে। আমি একটু বেলায় গেলেই হবে, চা-টা খেয়ে।

বাবী ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলো না, এক্ষনি যেতে হবে, নইলে অঘটন ঘ'টে যেতে পারে।

তপন আগে থানায় ফোন করলো।

আকাশে তখন কালো মেঘ উঠেছে, এলো চারিধার অন্ধকার হয়ে।

সকালবেলার সূর্য্য দেখা গেল না।

ঝড় আর জলে এলাহাবাদ শহর স্নান কর্‌তে লাগ্‌লো।

ওদের মোটর যখন জলে ঝাপ্‌সা যমুনাতীরের রাস্তা ধ'রে কালো অন্ধকারের মধ্যে সেই বাড়ীটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, তখন থানা থেকে সিপাহী এসে গেছে, কিন্তু সদর হাঁ-হাঁ করছে খোলা, তিনতলা অবধি সব শূন্য।

বাবীর চোখে তখন আগুন জ্বল্‌ছে।

বল্‌লে, আমি বলেছিলাম আর একটু তাড়া করতে না? দেরীর জন্যেই সব পণ্ড হ'য়ে গেল।

তখন ও অপ্রস্তুত।

বল্‌লে—এলাহাবাদ থেকে বেরিয়ে যাবার অনেক রাস্তা আছে। সব রাস্তায় পাহারা বসাচ্ছি। যদি শহর থেকে এখনো বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে ধরা পড়বে। আর যদি আর কোনো বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাহ'লেই ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

ফোন্ হাতে নিয়ে ব্যবস্থা করতে দেরী হল না।

বাবী আর শীলা গল্প করতে বস্‌লো, একটুখানির জন্যে এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল!

তখনো দিগন্ত অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে, তখনো আমের বনে জামের বনে ঝড়ের মাতামাতি।

থানা থেকে খবর পেয়ে প্রণব গিয়ে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে রেলপুলিশের সঙ্গে।

জলপুলিশ নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছে।

সেই দুর্য্যোগের দিনে বাবীর মনের দুর্য্যোগের তুলনা হয় না, তুলনা হয় না বিন্ধ্যাচলের শূন্যপুরীতে বিশ্বেশ্বরের চঞ্চলতার। মানুষের জীবনে এক একটা দিন এমন বিশ্রী আসে, যে সেদিনের কাহিনী সারা জন্মে ভোলা যায় না, কিন্তু

আরামকেদারায় ব'সে ছাপার অক্ষরে যারা সে ইতিহাস পাঠ করে, তারা ভাবে রোমাঞ্চটা আরো কেন ভয়ঙ্কর হ'ল না!

কলমের একটি খোঁচায় এলাহাবাদ থেকে আবুপাহাড় চ'লে যাওয়া যায়, কোথায় গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, আর কোথায় রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বতমালা।

কিন্তু যে বিধাতার লেখনীতে পৃথিবীর উপন্যাস তৈরী হয়, তিনি আরো অসাধ্যসাধন করতে পারেন মুহূর্ত্তের মধ্যে, উৎসরমুখরিত পম্পেয়াইয়ের ধ্বংসস্তূপে সে কথা গাঁথা আছে।

আমার এ ছোট কাহিনীর আর বেশী দূর নেই। যারা উৎসুক হ'য়ে উঠেছ, যারা শ্রান্ত হয়ে উঠেছ, তাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না। অভিশপ্তবংশের যবনিকা নেমে এলো ব'লে।

বৃষ্টি তখন একটু ধরেছে, আকাশ ঈষৎ পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে, একটা রূপালী উজ্জ্বল আলো জলেস্থলে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

বাবী ব'সেছিলো উৎকর্ণ হ'য়ে শীলা বুলাকে দুইপাশে নিয়ে।

গ্রামের সঙ্গিনী হাসু, রাণু, বিভা, অপর্ণা, ইন্দিরা, গৌরী, অঞ্জলি, বাসন্তী, মায়া, মঞ্জুশ্রী, নমিতা, গীতার কথা ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে, কোথায় তারা কতদূরে! কিন্তু

সকলকে ছাপিয়ে প্রদীপ।

খবর এলো—বেনারস যাবার রাস্তায় লাল পোল থেকে নাববার মুখে সন্দেহবশতঃ একটা মোটর আট্‌কানো হ'য়েছিল, তারা স'রে পড়বার চেষ্টা করতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে, মারা গেছে দাগী গুণ্ডা চিরঞ্জীলাল, জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেছে সঙ্গের ছেলেটি মাথায় চোট্ লেগে। এতক্ষণ আছে কি নেই! নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ভীষণ।

পড়ি-কি-মরি ক'রে বাবী এসে বস্‌লো গাড়ীতে, তপন ষ্টার্ট দিলে।

যে রাস্তা দিয়ে শর্টকাট্ করতে যাচ্ছিল, গিয়ে দেখ্‌লে সে পথ মেরামতের জন্যে বন্ধ। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হল।

ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে প্রদীপকে হস্পিট্যালে নিয়ে গেছে।

সিপাহী বল্‌লে, গাড়ীর আরোহীদের সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সে থামাতে বলে। সে কথা না শুনেই গাড়ী এগিয়ে যায়, তখন অগত্যা তাকে গুলি ছুঁড়তে হয়।

প্রথম গুলিতেই চিরঞ্জীলাল মারা পড়ে, যার মৃতদেহ রাস্তায় গাড়ীর পাদানীতে রক্তাক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে।

সেই অবস্থায়ই গাড়ী এগিয়ে যায় দেখে ও বাধ্য হ'য়ে

টায়ার পাংচার ক'রে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রীজের রেলিংএ গিয়ে গাড়ীর বনেট্ লাগে, প্রদীপ ছিট্কে বাইরে পড়ে, লোহার রেলিংএ ভীষণ আহত হ'য়ে সে অচৈতন্য হয়।

সঙ্গের লোকজনগুলোকেও ধ'রে হাজতে পাঠানো হয়েছে।

এই ইতিহাসটি শুন্তে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ বাবীর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে হস্পিট্যালে যাবার জন্যে। কিন্তু তার স্বামীকেও পুলিশ অফিসার হিসাবে কর্ত্তব্য করতেই হবে। ভাবপ্রবণ হ'লে তাদের কাজ চলে না।

পৃথিবীতে আরো কম ভাবপ্রবণ হচ্ছে ডাক্তাররা। বাবী যে ব্যস্ততা নিয়ে হাঁসপাতালে এলো সে ব্যস্ততা চিকিৎসকদের কাছে অভ্যস্ত। তার অজস্র প্রশ্নের উত্তরে শুধু সে জান্তে পার্লে প্রদীপের জ্ঞান এখনো হয়নি। বিপদের আশঙ্কা ত' আছেই, কাট্বে কিনা কিনা সে কথা বলবার এখনো সময় হয়নি।

সেখানে ঘরে ঘরে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। একটা বেডের পাশে অরেকটা বেডে মরণের শীতলস্পর্শ নেমে আসছে যে কোনো মুহূর্ত্তে, তার পাশে যে কম্পমান জীবন, তার কী অবস্থা হচ্ছে তা দেখ্বার কেউ নেই!

প্রণব প্রদীপের মাথার কাছে ছিল, ঘরে ভিড় বাড়ানো ডাক্তারের নিষেধ ছিল।

বাবী বাইরে থেকে অস্থির হ'তে লাগ্লো।

আয়ডোকর্ম আর [illegible] ভারাক্রান্ত।

দূর শহর থেকে মানুষের কলরোল [illegible] মতন ভেসে আসে।

তিন দিন বাদে প্রদীপ প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লো—বাবী এসেছে? বাবীকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বাবী বল্‌লে—আমি এসেছি প্রদীপ।

প্রদীপ চিন্‌তে পারলে না। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বল্‌লে—বাবী আর দাদু কোথায়?

দাদু পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—আমি এসেছি দাদু।

ডাক্তার বললে—আপনারা দয়া ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমাদের কাজ করতে দিন।

রাত আর দিন, দিন আর রাত—এতগুলি প্রাণীর ভগবানের কাছে অক্লান্ত আকুল প্রার্থনা অবশেষে মঞ্জুর হ'ল।

প্রতুল চোখ চাইলে।

কথা বললে।

সেদিন বাবীর জ্বর, সে আস্‌তে পারেনি।

যে চিকিৎসক তাঁর সমস্ত বিদ্যা আর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে এই রুগ্ন কিশোরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন—তাঁর

নাম ডাক্তার অতুল রক্ষিত।

বিশ্বেশ্বর বললেন, আপনার ঋণ কী ক'রে শোধ করব?

পারেন যদি দেশে আরো বেশী হস্পিট্যাল ক'রে—ডাক্তার স্মিতহাস্যে বললেন। আমাদের দেশে গরীবদের চিকিৎসা হয় না, আপনারা ধনীরা একথা ভুলবেন না।

প্রদীপের কাণেও একথা গেছলো।

যে কদিন সে ক্যাবিনে ছিল, চারিধারের ব্যবস্থার খোঁজ নিত।

খবর নিয়ে তার এই কথাটি মনে হ'ল—আমাদের দেশে আজো গরীবদের চিকিৎসা হয় না।

বাবী সেদিন এসেছিলো—বললে—তা'হলে এত বড় বড় হস্পিট্যালগুলো কী করতে আছে?

প্রদীপ বললে—বড় বড় শহরের শোভা বাড়াবার জন্যে।

সেরে উঠেও নিস্তার নেই।

চিরঞ্জীলালের দলবলের বিচার সুরু হল। সাক্ষী দিতে হবে তাকে। আসামীদের মধ্যে ছিল তার নকাকা আর নতুন কাকা, আরো অনেকগুলি গুণ্ডা, খুন, রাহাজানি, লুঠতরাজ, নোট জাল, আগুন লাগানো, যাদের কোনো পাপ বাদ যায়নি।

কয়েকজনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কয়েকজনের ফাঁসি।

মৃত্যুদণ্ড পেলে তার দুই কাকা, তারা নাকি সাতটা খুন করেছে।

দুনিয়ার আবর্জ্জনা তারা, কিন্তু বিশ্বেশ্বর হাজার হোক্ বাপ, বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

শিবরাত্রির শেষ শলতেটিকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মছলন্দপুরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলেন।

দুর্জ্জনের দিক্ থেকে তাঁর পৌত্রের আর ভয় রইলো না



মছলন্দপুর

বটে, কিন্তু মরণের কাছ থেকে তিনি কোনো ভরসা পাননি।

এত রুগ্ন আর দুর্বল সে হ'য়ে পড়েছে ইদানীং—তাকে রেখে তিনি যেতে পারলে হয় !

এবার তিনি যেতে চান, প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। গঙ্গার ধারে নিজের বাড়ীতে এসে তিনি প্রণবকে জমীদারী ও সম্পত্তির সব কাগজপত্র বোঝাতে লাগ্‌লেন, উইল দেখালেন—তিন কোটি টাকার মালিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন মল্লিক বংশের শেষ ছেলেটিকে। একজিকিউটর হ'ল প্রণব।

জীবনে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন, তবুও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হ'ল ?

সে বুড়িটা এখন নেই যে ঝড়ের রাত্রে এসে চ্যাঁচাত—ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও ! কিন্তু যে কোনো ঝড়ের রাত্রে তার প্রতিধ্বনি আছে।

যেদিন তাঁর অসুখ করলো, সেদিন থেকে পথ্য এবং ওষুধ দুই তিনি বন্ধ করলেন, ডাক এসেছে যদি, আর তিনি সুযোগ যেতে দেবেন না।

প্রদীপকে তিনি রেখে যাচ্ছেন যোগ্য শিক্ষকের হাতে এই তাঁর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

মৃত্যু যে মহান্ হয়, মৃত্যু যে সুন্দর হয়, হয় সূর্য্যাস্তের মতন মনোরম কখনো কখনো—এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়া দেখে প্রদীপ বুঝতে পারলো।

তাঁর প্রিয় লাইব্রেরী-ঘরে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করলেন প্রিয়তম পৌত্রকে শেষ আশীর্ব্বাদ ক'রে।

তিন কোটি টাকার কিচ্ছু কিন্তু প্রদীপ পেলে না। তার নাবালকত্ব আগে অতিক্রম করা চাই।

সাধারণ ছেলেদের মতন সাধারণ বেশে প্রদীপ সাধারণ স্কুলে যেতে লাগ্‌লো।

ম্যাট্রিক পাশ করলো, বি-এ পাশ করলো।

তখনো তার কুড়ি বছর হয়নি।

লাইব্রেরী ঘরে প্রণব ভারী একখানা বই নিয়ে তন্ময় হ'য়েছিলো। প্রদীপ এসে বললে—টাকাটা বাড়াবার কি করছেন?

সে কথা তোমার এখন না জান্‌লেও চলে! গম্ভীরমুখে প্রণব বললে।

আমার এক বন্ধু বলছে, কিছু শেয়ার কিন্‌লে হয়।

নিজে কিন্‌তে গেলে ঠকতে হবে, শেয়ার ডীলাররা প্রায়ই জোচ্চোর।

তাহ'লে গভর্ণমেণ্ট প্রামিসারি নোট কিম্বা ফিক্সড্ ডিপজিট?

সে তোমায় ভাবতে হবে না।

প্রদীপ একটু বিরক্ত হ'ল। তার টাকা, সে কথা কইতে পাবে না। সাবালক হ'তে আর ক'মাসই বা আছে?

প্রণব বুঝতে পেরেও কিছু বললে না।

চ'লে যাচ্ছে দেখে ডেকে বললে—এই লাইব্রেরীটা শেষ করো। বিশ্বভারতীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরী দেখে এসো। ইউনিভারসিটির চৌকাট না মাড়িয়েও একজন লোক কি ক'রে মহামানব হ'য়ে উঠলেন, হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-দের শীর্ষমণি, বহু পশ্চাতে ফেলে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ধারীদের, তার মূলতত্ত্বটি বুঝ্তে শেখো।

প্রদীপের কথাটা ভালো লাগ্লো না, সে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুরা তাকে বিরক্ত ক'রে মারছে, তোর মাষ্টার সব সরিয়ে ফেললে। যে দিন তোর হাতে বিষয় আসবে, দেখ্বি সব শেষ!

প্রণবের চালচলন দেখে ওর সেই সন্দেহ ক্রমশঃ দৃঢ়তর হ'তে লাগ্লো।

একুশ বছর পূর্ণ হ'তে যখন আর তিন মাস আছে, ও ঝড়ের মতন এসে প্রণবকে বললে—কেন আপনি আমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন না?

এখনো সময় হয়নি।

সময় কবে হবে মাষ্টার মশাই, যেদিন আপনি সব শেষ ক'রে দেবেন?

প্রণব একটীও কথা না ব'লে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগ্লো।

একুশ বছর যেদিন পূর্ণ হল, প্রদীপকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণব তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলে—তিন কোটি টাকা হ'য়ে গেছে চার কোটি, আর জমিদারী বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

পায়ে প'ড়ে প্রদীপ বললে—আমায় ক্ষমা করুন্!

প্রণব বললে—ক্ষমা নেই, গড়তে চেয়েছিলাম রত্ন, হ'লে আবর্জ্জনা।

আপনার প্রাপ্য নিয়ে যান্। বলতে গেলে এ এক কোটি টাকার কিছুটা আপনার প্রাপ্য।

যতটা আমার প্রাপ্য, তাইতে হাঁসপাতাল ক'রে দিয়ো—মাতৃসদন, অনাথ-আশ্রম যা পারো। সেই ডাক্তারের কথা মনে করো—বড় গরীব আমাদের দেশ।

ওদিকে বন্ধুরা মোটর নিয়ে ডাকাডাকি করছে, প্রদীপ আর দাঁড়ালো না, কথা বাড়ালো না।

ফূর্ত্তিতে বদ্‌খেয়ালে আড্ডায় খোলামকুচির মতন ঝক্‌ঝকে টাকা চক্‌চকে নোট উড়ে যেতে লাগ্‌লো—বিশ্বেশ্বরের কষ্টসঞ্চিত আর বহুজনের দীর্ঘশ্বাসে কলুষিত অর্থ।

কলকাতা থেকে কাশ্মীর সেই টাকার ভোজবাজী দেখ্‌লো। অভিশপ্ত-বংশের শেষ প্রদীপের কুকীর্ত্তি দেখে বিশ্বেশ্বরের অভিশপ্ত আত্মার কী মনে হয়েছিল সে কথা কেইবা জানে?

যখন নগদ টাকা আর জমিদারীর অল্পই অবশিষ্ট আছে,

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তখন একদিন প্রদীপের মনে পড়লো—সে কোথায় চলেছে। চলেছে ধ্বংসের পথে, চিরব্যর্থতার পথে, অমানুষের পথে।

সেদিন সে সর্ব্বস্ব ফুইয়ে এক হস্পিটাল করলো। কটাই বা বেড্ হ'ল!

কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—প্রণববাবুর জন্যে।

তাকে পাওয়া গেল না।

বাবীকে ডাকলে—মেট্রন হ'তে।

সে এলো না। সে পরের ঘরের বৌ।

তাছাড়া সমস্ত খবর তার কাছে পৌঁছেছিল।

তার মতন কষ্ট কেউ পায়নি।

**সমাপ্ত**

